দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

এই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ
আমার দেশ নয়
—পৃঃ ২৩

৭২ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৯।। ১৩ পৌষ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

প্রতিবাদের নামে দেশজুড়ে তাণ্ডব
জাতীয় পতাকা হাতে জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ১৩ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

৩০ ডিসেম্বর - ২০১৯, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ■ ৫

বামপন্থী প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না ■ বিশ্বামিত্র ■ ৬

খোলা চিঠি : গণভোট চাই ■ সুন্দর মৌলিক ■ ৭

ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির চাকা কি থেমে যাবে? ■ অরবিন্দ পানাগড়িয়া ■ ৮

রাজ্যশাসনে রাজ্যপালের সক্রিয়তা সংবিধানসম্মত ■ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ■ ১১

মাননীয়া ও ডাক্তারবাবুর ষড়যন্ত্র ■ দীপ্তিমান সেনগুপ্ত ■ ১৩

শরণার্থী ও উদ্বাস্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সিএএ ২০১৯-এর ভূমিকা ■ সুদীপ সিকদার ■ ১৪

নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নাগরিকত্ব আইনকে রদ করা যাবে না ■ সাধন কুমার পাল ■ ১৬

এই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ আমার দেশ নয় ■ সুজিত রায় ■ ২৩

রাজ্যব্যাপী হিংসার পিছনে আছে গভীর ষড়যন্ত্র ■ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ■ ২৬

ভারতের নারী (রাজস্থান) ■ সমরেশ মুখোপাধ্যায় ■ ৩১

অনন্তভাবময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ■ স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ ■ ৩৩

রবীন্দ্র এবং অরবিন্দ : সামীপ্য-সান্নিধ্য ■ ডা: সন্দীপননন্দন ঘোষ ■ ৩৫

গল্প : টনিক ■ রূপশ্রী দত্ত ■ ৩৭

শীর্ষ আদালতে স্থগিতাদেশের আর্জি নাকচ, হতাশ বিরোধীরা ■ ভাস্কর ভট্টাচার্য ■ ৪৩

নাগরিকত্ব আইন ধর্মীয় সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুদের জন্য সঞ্জীবনীস্বরূপ ■ রঞ্জন কুমার দে ■ ৪৪

নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেসের আরও অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন ■ মণীন্দ্রনাথ সাহা ■ ৪৬

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ■ **চিঠিপত্র : ১৯-২০** ■ **অঙ্গনা : ২১** ■ **সুস্বাস্থ্য: ২২** ■ **সমাবেশ-সমাচার : ২৮-৩০** ■ **খেলা : ৩৯** ■ **নবাঙ্কুর : ৪০-৪১** ■ **চিত্রকথা : ৪২** ■ **সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৮** ■ **সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০**

প্রকাশিত হবে ৬ জানুয়ারি ২০২০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৬ জানুয়ারি ২০২০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্বামীজী এবং আজকের ভারত

স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক ভারত নির্মাণের প্রধান ঋত্বিক বললে অত্যুক্তি করা হয় না। স্বামীজীর প্রয়াণ ১৯০২ সালে। তারপর ১১৭ বছর কেটে গেছে। কিন্তু যে গরিমাময় ভারতের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন আজকের ভারত কি তা হয়ে উঠতে পেরেছে? সরকার শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেবার কথা ভাবলে যখন উন্মত্ত জনতা ট্রেনে-বাসে আগুন লাগায়, জাতীয় পতাকা হাতে জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করে— তখন মনে হয় এই ভারত স্বামীজীর স্বপ্নের ভারত নয়। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয়— স্বামীজী এবং আজকের ভারত।

আজকের ভারতের প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর চিন্তা ও দর্শন ব্যাখ্যা করবেন স্বামী ত্যাগীবরানন্দ, ড. কল্যাণ চক্রবর্তী, ড. রাকেশ দাশ প্রমুখ।

দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank - Kolkata
Branch : **Shakespeare Sarani**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

এন পি আর এবং রাজ্য

রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এক বিজ্ঞপ্তি মারফত জানাইয়াছে, জাতীয় জনসংখ্যা পঞ্জীকরণ অর্থাৎ ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার বা এনপিআর- এর কাজ আপাতত স্থগিত রাখা হইল। আবার এও শোনা যাইতেছে আগামী বৎসরের এপ্রিল হইতে ইহার কাজ পুনরায় চালু হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। পাঠকের স্মরণে থাকিতে পারে কিছুদিন আগে পর্যন্তও সিএবি আসিবার পূর্বে দূরদর্শনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এনপিআর-এর স্বপক্ষে প্রচার করিতেছিলেন। তাহার আশ্বাস বাণী শোনা যাইতেছিল যে ইহা নিছক দেশবাসী সম্বন্ধে সরকারের তথ্য লইবার প্রয়াসমাত্র, যেমন জনগণনার সময় লওয়া হইয়া থাকে। তিনি পশ্চিমবঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত এও বলেন ইহাতে ভীত হইবার কোনও কারণ নাই, ইহা নিয়মমাফিক সরকারি প্রক্রিয়া-মাত্র। তিনি থাকিতে এ রাজ্য হইতে কাহাকেও বিতাড়িত করা হইবে না। সর্বশেষে তিনি এন পি আর বিষয়ে সরকারি কর্মীদের সাহায্য করিবার অনুরোধও রাজ্যবাসীকে জানান।

হঠাৎ এমন কী হইল যাহাতে নবান্নের সরকারি কর্তারা ইহার মধ্যে স্বচ্ছতার অভাব দেখিলেন? এনপিআর-এর ইতিহাস বলিতেছে ইহার প্রক্রিয়াটি মোদী-অমিত শাহের পরিকল্পনা মাফিক শুরু হয় নাই। সোনিয়া-মনমোহনের দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের জমানায় ২০১০ সালে প্রক্রিয়াটির সূচনা হয়। ২০১১ সালে জনগণনার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কাজ চলিতে থাকিল। ২০১৫ সালে বাড়ি বাড়ি গিয়া পুনরায় এ ব্যাপারে তথ্য সংগৃহীত হয়। জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে ছিল ব্যক্তির নাম, বাবার নাম, মায়ের নাম, বিবাহিত হইলে স্ত্রীর নাম, ঠিকানা, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি। সব মিলিয়া যাঁহারা ভারতবর্ষে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সংক্রান্ত তথ্য সরকারের হাতে থাকুক, যাহাতে তাহাদের উন্নয়ন খাতে বাজেট বরাদ্দ করিতে এবং তাহার সুযোগ দেশবাসী গ্রহণ করুক ইহাই ছিল এনপিআর-এর প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এই সদর্থক পরিকল্পনার গোড়াপত্তন অবশ্য বাজপেয়ী সরকারের আমলে হইয়াছিল। ২০০৩ সালে 'রেজিস্ট্রেশন অব সিটিজেন্স অ্যান্ড ইস্যু অব ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড' নামক যে তথ্যভাণ্ডার গড়িয়া তুলিবার আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ গৃহীত হয় তাহাই এনপিআর-এর মূল কথা। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা ভারতবাসী সম্পর্কে সরকারের অবহিত হইবার প্রক্রিয়া মাত্র যাহাতে সরকারি নীতি-নির্ধারণে সুবিধা হয়। কিন্তু ইহা ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণের মাপকাঠি হইতে পারে না। এই 'নাগরিকত্ব' বিষয়টি লইয়া কায়েমি স্বার্থে জলঘোলা চলিতেছে। ভারতবর্ষে যিনিই আসিবেন তিনিই 'নাগরিক', এই নীতি থাকিলে দেশের রসাতলে যাইবার অপেক্ষা করিতে হইবে না।

কাহাদের এই দেশের নাগরিক হিসেবে গণ্য করিতে হইবে, তাহার মাপকাঠি কী হইবে, তাহার ইতিহাস দীর্ঘ। তাহা বর্ণনার অবকাশ এখানে নাই। কিন্তু এই বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি লইয়া কেন্দ্র সরকার কয়েকটি পরিকল্পনা করিয়াছে, যেমন এনআরসি যাহার লক্ষ্য ভারতে অবৈধ অভিবাসীদের চিহ্নিত করা, সি এ এ যাহার প্রক্রিয়াটি দেশ জুড়ে পয়লা এপ্রিল হইতে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ করিবার কথা, তাহার পরের বৎসর আদমশুমারি বা জনগণনার প্রক্রিয়া চলিবে।

কিন্তু রাজ্য সরকার এ বিষয়ে তাহার প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করিবার, এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত লইয়া একপ্রকার সাংবিধানিক সংকট ডাকিয়া আনিতে চলিয়াছে। বামপন্থীরা যে সংকটের আশায় উৎফুল্ল হন, রাজ্য সরকারি নীতির যে কোনও বদল হয় নাই, সরকার বদলাইলেও; ইহাতে তাহাই প্রমাণ হয়। ইহার ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়নের নীতি-নির্ধারণে কেন্দ্রের অসুবিধা হইবে। ইদানীং দেখা গিয়াছে জনগণের মনোভাব বুঝিতে কেন্দ্র-বিরোধী রাজনীতির প্রবল অনীহা। বিগত লোকসভা নির্বাচন তাহাদের শিক্ষা দিয়াছে। দেওয়াল লিখন পড়িবার এখনও সময় আছে নচেৎ ভবিতব্য বড়োই কঠিন।

সুভাষিতম্

পাত্রে ত্যাগী গুণে রাগী ভাগী পরিজনৈঃ সহ।

শাস্ত্রে বোদ্ধা রণে যোদ্ধা প্রভুঃ পঞ্চগুণো ভবেৎ।।

যিনি যোগ্য পাত্রে দান করেন, অপরের গুণ স্বীকার করেন, সুখ-দুঃখ বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে ভাগ করে নেন, শাস্ত্রে পারদর্শী, যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করেন—এই পাঁচটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান তিনিই প্রকৃত অর্থে পুরুষ পদবাচ্য।

বামপন্থী প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না

বিশ্বামিত্র-র কলম

ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা জিনিস চাউর হয়েছে। ভারতবর্ষের দুটি মানচিত্র দেখানো হচ্ছে, ২০১৭-র শেষে দেখা যাচ্ছে সেই মানচিত্রের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগের রং গেরুয়া, ২০১৯-এর শেষে এই ৭০ শতাংশ দাঁড়িয়েছে ৩৫ শতাংশে। রাজ্যের ক্ষমতা দখলের নিরিখে এই ধরনের মানচিত্রের নকশা পরিকল্পনা করা হয়েছে। এটা ঠিক গত এক বছরে বিজেপির হাতছাড়া হয়েছে বেশ কিছু রাজ্য যেমন মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র, এখন ঝাড়খণ্ড ইত্যাদি। ফলে ২০১৭-র শেষে যে গেরুয়া মানচিত্র দেখা যাচ্ছিল, ২০১৯-এ তা অনেকটাই ফিকে। এই দুই মানচিত্র তুলে ধরে প্রতিপন্ন করতে চাওয়া হচ্ছে দেশের মানুষ মোদী-অমিত শাহকে চাইছে না, সিএবি-এনআরসি চাইছে না ইত্যাদি।

কিন্তু মুশকিল হলো, উট বালিতে মুখ গুঁজে থাকলেও প্রলয় থেমে থাকে না। বিরোধীরা যখন আত্মপ্রসাদে ভর করে স্থির করে নিয়েছিল রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে মায়া-মুলায়ম-মমতা- চন্দ্রশেখর- ইয়েচুরি-কেজরিওয়াল প্রমুখের এক 'প্রধানমন্ত্রীমণ্ডলী' দেশ শাসন করবে তখন জনগণ এঁদের সসম্মানে বিদায় নিয়ে নিশ্চিত ও নিশ্চিহ্ন দুই-ই করেছেন, এই ২০১৯-এই। দেশের মানচিত্রটাই পুরো গেরুয়া আকার ধারণ করেছিল। একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে রাজ্যগুলিতে বিজেপি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে সেখানে দীর্ঘদিন বিজেপির সরকার ছিল যেমন মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, কিংবা ঝাড়খণ্ড। ফলে শাসকদলের বিরোধী ভোটদানের প্রবণতা যাকে 'অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সি ফ্যাক্টর' বলা হয় তা এসব জায়গায় পূর্ণমাত্রায় ছিল। তারপরেও বিজেপি মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যে কংগ্রেসের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাবে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হলেও, অনৈতিক জোট করে বিজেপিকে আটকানো হয়েছে। যেমন মহারাষ্ট্রে, কিছুদিন আগে কর্ণাটকেও এই পরিস্থিতি ছিল।

এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, রাজ্যের ভোটে স্থানীয় ইস্যু যে গুরুত্ব পায়, দেশের সাধারণ নির্বাচনে তেমনি জাতীয় ইস্যু একই গুরুত্ব পায়। সুতরাং সিএবি বা এনআরসি ঝাড়খণ্ড নির্বাচনে প্রভাব ফেলেছে ভেবে যে নিষ্কর্মা বামপন্থীরা সোশ্যাল মিডিয়ার উল্লাস প্রকাশ করছেন, তাঁরা নেহাত মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। আমাদের সমস্যা তা নিয়ে নয়। সমস্যা হলো দেশের জনমতকে সুকৌশলে প্রভাবিত করার চেষ্টাটা নিয়ে।

বিরোধীরা কোনওদিনই হার বলে বস্তুটিকে মেনে নেয়নি। হারের আত্মসমীক্ষার মানসিকতা তাদের ছিল না। ইভিএমকে কাঠগড়ায় তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছিল তাঁদের মান বাঁচানোর কৌশল।

আজ অ্যান্টি ইনক্যাম্বেন্সি ফ্যাক্টরের সুযোগ নিয়ে যখন জিতছে, তখন আর ইভিএমে কোনও গলদ নেই, 'যত দোষ নন্দ ঘোষ' এখন দেশের নাগরিকত্ব ইস্যু। এই বিরোধীদের বকলমে বামপন্থীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখানোর চেষ্টা করছে দেশের মানুষ কীভাবে বিজেপির বিপক্ষে চলে গিয়েছে, তাদের হাতিয়ার ওই দুটি মানচিত্র, যেখানে বিভিন্ন রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতার ভিত্তিটুকু কেবল দেখানো হয়েছে। এই রাজ্যগুলির সিংহভাগেই প্রবল প্রতাপ এককভাবে বিরোধী আসনে বিজেপির অস্তিত্ব রয়েছে। এবং আগামী নির্বাচনেই প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা।

তাই এর সঙ্গে 'নাগরিকত্ব' ইস্যুর কোনও সম্পর্ক নেই। বিভিন্ন সমীক্ষায় স্পষ্ট হয়েছে দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আজও মোদীকেই চান, নাগরিকত্ব বিলের প্রতিও তাঁদের সিংহভাগের সমর্থন। এঁরাই বিজেপিকে লোকসভা-রাজ্যসভায় প্রয়োজনীয় সংখ্যা দিয়েছেন, তাই সাংবিধানিক গণ্ডীর মধ্যেই সবকিছু করা সম্ভব হচ্ছে, যা গত সত্তর বছরে সম্ভবপর ছিল না। ■

বিরোধীরা কোনওদিনই হার বলে বস্তুটিকে মেনে নেয়নি। হারের আত্মসমীক্ষার মানসিকতা তাদের ছিল না। ইভিএমকে কাঠগড়ায় তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা ছিল তাঁদের মান বাঁচানোর কৌশল।

গণভোট চাই

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

মার্কিন বিদেশ সচিব মাইক পম্পিও জানিয়েছেন নাগরিকত্ব আইনের বিষয়টি একেবারেই ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। তা নিয়ে আমেরিকা নাক গলাবে না। অথচ, তাঁদের অবস্থানের সঙ্গে চরম বৈপরীত্য তৈরি করে রানি রাসমণি রোডের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, ''নাগরিকত্ব আইনের উপর ভারতে গণভোট হোক। আর তা হোক রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে। তখনই বোঝা যাবে এই আইন ক'টা লোক মানছেন, ক'টা লোক মানছেন না।''

দিদির এই মন্তব্যই নতুন বিতর্ক উস্কে দিয়েছে। তার কারণ কী? পর্যবেক্ষকদের মতে, কারণটা পরিষ্কার। ভারতবর্ষ একটি গণতন্ত্র। দলমত নির্বিশেষে দিল্লির সরকারের বরাবরের অবস্থান হলো ঘরোয়া বিষয়আশয় তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে মীমাংসায় সক্ষম ভারত। এ ব্যাপারে বাইরে থেকে কারও নাক গলানো বরদাস্ত করা হবে না।

এ দেশের রাজনীতিতে সম্ভবত শেখ আবদুল্লাহই কাশ্মীর নিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের তত্ত্বাবধানে গণভোটের দাবি জানিয়েছিলেন। নয়া দিল্লি তখনও তা মানেনি। কিন্তু পাকিস্তান আজও তা অস্ত্র করে। যেমন, কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের পরেও রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ দাবি করেছিল পাকিস্তান। আবার নাগরিকত্ব আইন পাশের পরেও ইমরান খান সরব হয়েছেন। বলেছেন, নাগরিকত্ব আইনের ফলেও কাশ্মীরের মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হবে।

বস্তুত মুখ্যমন্ত্রী গণভোটের দাবি জানানোর পর থেকেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আন্দাজ করছিলেন, সংখ্যালঘুরা মমতার এই মন্তব্য লুফে নিতে চাইবে। তারপর এটাই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে হাতিয়ার করতে চাইবে। হয়েছেও তাই। অন্যদিকে অনেকে বলছেন, ''এ ধরনের কথা তো পাকিস্তান বলবে। ওঁর মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন নেত্রীর মুখমন্ত্রীর পদে থাকাই উচিত নয়''। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ও বলেছেন, ''আমাদের গণতন্ত্র যখন এতটা পরিণত হয়েছে, তখন এ বিষয়ে বাইরের হস্তক্ষেপ দাবি করা ঐতিহাসিক ভুল। তা ছাড়া নাগরিকত্ব আইনটি সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। সর্বোচ্চ আদালত তা খতিয়ে দেখছে। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এখনই তাঁর কথা প্রত্যাহার করে নেওয়া।'' না, প্রত্যাহার করেননি দিদি। তিনি পাল্টি খেয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, কোন ভাবনা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গণভোটের দাবি তুলেছেন?

উনিশের লোকসভা নির্বাচনে দেশের মোট ভোটারের ৩৮ শতাংশের ভোট পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। অর্থাৎ ৬২ শতাংশ ভোটার বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। সুতরাং বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জিতে সরকার গড়লেও দেশের বেশিরভাগ মানুষ তাদের বিরুদ্ধে। নাগরিকত্ব আইন নিয়ে গণভোট হলে স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপির পরাস্ত হওয়ার কথা। সম্ভবত, এই অঙ্কটা মাথায় নিয়ে গণভোটের প্রস্তাব দিয়েছিলেন মমতা। কিন্তু তিনি তা ব্যাখ্যা করেননি। আর তাতেই গোলমালটা করে বসেছেন।

এখন দিদি পাল্টি খেয়েছেন। নানা কথায় নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু বাস্তব সত্যটা হলো তাঁর গলায় পাকিস্তানের সুর। অতীতেও সার্জিক্যাল স্ট্রাইক থেকে ৩৭০ ধারা অপসারণ, সবেতেই পাক সুরে বিরোধিতা করেছেন তিনি। এবার আবার পাকিস্তানকে সুর বেঁধে দিয়েছেন।

মাননীয় পাঠক, দিদি কিন্তু বেজায় বিপজ্জনক কথা বলেছেন। ইতিহাস সেই কথাটা মনে রাখবে। রাজনীতিতে শব্দই হলো ব্রহ্ম। একবারও তা মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে, পরে ম্যানেজ করা মুশকিল। তিনি যতই এখন অন্য কথা বলুন না কেন তাঁকে শুনতেই হবে তাঁর স্লোগান। দিদি ছিঃ ছিঃ!

—**সুন্দর মৌলিক**

ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির চাকা কি থেমে যাবে?

অতিথি কলম

অরবিন্দ পানাগড়িয়া

না, কথাটা মানা যায় না। ইতিহাস বলছে অর্থনীতির উত্থান-পতন অতীতেও ঘটেছে। দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক চলতি অর্থবর্ষের বৃদ্ধির গতির পূর্বাভাষ আগের চেয়ে কমিয়ে ৫ শংতাশে ধার্য করেছে। কিন্তু আমাদের কিছু বিশ্লেষক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদকদের যে প্রচণ্ড হতাশা ও নেতিবাচক মানসিকতা ঘিরে ধরেছে তাতে করে মনে হতে পারে তাঁরা হয়তো এই বৃদ্ধির আগে একটা বিয়োগ চিহ্ন (– ৫ শতাংশ) আশা করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হওয়ার পরের ইতিহাসটি একটু চর্চা করলে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

১৯৯১ থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে যখন সংস্কারের কাজে হাত দেওয়া হয় তখন থেকেই অর্থনীতির উন্নয়নের সূচকে বরাবর দোলাচল চলেছে। কখনও অত্যন্ত উচ্চ বৃদ্ধির সময় গেছে আবার কখনও বা অর্থনীতির নিম্নগতি দুই বা তিন বছর ব্যাপী টানা চলছে। ইতিহাস সাক্ষী যখনই অর্থনীতি নিম্নমুখিতার চক্রে ঢুকেছে তখনই নানা জাতের সংশয়বাদী ও নিরাশাবাদীরা সামনে এসে গেছেন। শুধু আশা নয়, তারস্বরে ঘোষণাও করে দিয়েছেন ভারতীয় অর্থনীতির বৃদ্ধির গল্প শেষ হয়ে গেল এ আমরা হলফ করে বলছি। হায়! অর্থনীতি প্রতিবারই এই পণ্ডিতদের হতাশ করেছে।

এই সংস্কারপর্বে ভারত ১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৯-২০০০ অর্থবর্ষ অবধি গড় বৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশে ধরে রেখেছিল। এই প্রথম নাগাড়ে ৮ বছর ধরে ভারতের অর্থনীতিতে ৬ শতাংশের ওপর বৃদ্ধি ঘটে ছিল। এই পর্বে কেবল ১৯৯৭-৯৮ সালে পূর্ব আফ্রিকায় কারেন্সি সমস্যা দেখা দেওয়ায় মাত্র এক বছরের জন্য বৃদ্ধির হার মার খেয়েছিল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে দাঁড়িয়ে পরবর্তী ২ বছরে পর পর বৃদ্ধির হারকে গড়ে ৭.৫ শতাংশে টেনে নিয়ে যায়।

মনে রাখা দরকার, নতুন সহস্রাব্দে এসে সরকারি নীতিতে কোনো পরিবর্তন বা বড়োসড়ো রদবদল না ঘটলেও বৃদ্ধির গতি ২০০০-০১ থেকে ২০০২-০৩ অর্থাৎ টানা তিনটি অর্থবর্ষে গড়ে ৪.১ শতাংশে নেমে আসে। যথারীতি অর্থনীতির সর্বনাশের সঙ্কেত প্রকট হয়ে উঠেছে ধ্বনি তুলে নিরাশাবাদীরা লাফিয়ে পড়তে দেরি করেনি। যোগ দিয়েছিল প্রচারমাধ্যমগুলিও। অর্থনীতিবিদ Bralford Delong এই সময় ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারগুলিই এই অধোগতির কারণে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। আর এক দিগ্‌গজ Desi Rodviele ও অরবিন্দ সুব্রহ্মনিয়াম আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে সটান বললেন ভারতে ১৯৯১-এ লাগু করা সংস্কার প্রক্রিয়াগুলি দেশের কোনো উন্নতিতেই লাগেনি। তাঁরা বোঝালেন ৮০-র দশকের উন্নয়নের তুলনায় ৯০-এর দশকে বৃদ্ধির গতিতে বিশেষ কোনো হেরফের হয়নি।

সংস্কারের এই চিরনিন্দুকদের উল্লাস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। উপর্যুপরি প্রধানমন্ত্রী নরিসিমহা রাও অটলবিহারী বাজপেয়ীর এককাট্টা হয়ে সংস্কার প্রক্রিয়ায় গতি আনার ফলে চমকপ্রদ ফল হয়। বাজপেয়ী জমানার শেষ অর্থবর্ষে বৃদ্ধির সীমা ৭.৯ শতাংশে পৌঁছয়। এর পরবর্তী অর্থবর্ষগুলিতে দীর্ঘ ৯ বছর ধরে (২০০৩-০৪ থেকে ২০১১-১২) অর্থনীতিতে ২০০৭-০৮-এর ব্যাপক ধসের বছরে একটু নেমে যাওয়ার পর ২০০৯-১০, ১১-১২-তে আবার তা স্বমূর্তিতে ৮.৫ শতাংশে উঠে যায়। অর্থনীতির এই দুর্ধর্ষ প্রদর্শন অন্তত সাময়িকভাবে হলেও সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেয়। মজার কথা, এই ফলাফল দেখার পর সংস্কারের সমালোচক সুব্রহ্মনিয়াম নিজের ধারণা পাল্টে নেন। ২০০৭ সালে লেখা এক প্রতিবেদনে তিনি লেখেন ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিকে লাটিন আমেরিকার দেশগুলির অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার প্রচেষ্টাটি ঠিক নয়। ভারতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজ করেছে সরকারের নেওয়া সংস্কার প্রক্রিয়াগুলি। এর ফলে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের মনে একটা আত্মবিশ্বাসের জন্ম নিয়েছিল। তারা বুঝেছিল সরকারি নীতিগুলি ব্যবসার পরিবেশের অনুকূলেই হবে, ক্ষতিকারক কখনই নয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের তরফে বেশ কিছু ভুল নীতি প্রয়োগের ফলে অর্থনীতি আবার শ্লথগতির চক্রে পড়ে যায়। ইউপিএ-২-এর শেষপর্বের দ্বিতীয়ভাগে বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের নীচে নামে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকে চূড়ান্ত হতাশাজনকভাবে বৃদ্ধি ৪.৩ শতাংশে নেমে যায়। সকলেই আন্দাজ করুন এই পরিসংখ্যান হতাশার ধ্বজাধারীদের ডেকে আনার পক্ষে আদর্শ। ২০১২ সালের তাদের রিপোর্টে প্রখ্যাত সংস্থা standard and poor খুবই কাব্যিক ব্যঙ্গের সুরে জানায় 'will India be the BRICK fallen angel?' অর্থাৎ ব্রিক দেশগুলির মধ্যে থেকে তবে কি ভারতই প্রথম নক্ষত্র পতন করে দেখাবে? এরই প্রতিধ্বনি করে ২০১৩ সালের আগস্টে The economist তাদের 'India in trouble' শীর্ষক নিবন্ধে ঘোষণা করে দিয়েছিল যে এখন অর্থনীতির দুনিয়ার সব বিশারদই একরকম মেনে নিয়েছেন যে ভারত ১৯৯১-এর পর থেকে এইবার অর্থনৈতিক দুর্গতির চরম আবর্তে প্রবেশ করেছে।

কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতার মতোই ভারতীয় অর্থনীতির গতি আরও একবার সংশয়বাদীদের হতাশ করল। ইউপিএ-২ সরকারের তরফের কিছু ভুল শুধরে নেওয়ার পরই বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে আসে। ফলস্বরূপ অর্থনীতি আবার তার স্বাস্থ্যকর চলন ফিরে পায়। ২০১৪-১৫ থেকে ১৮-১৯ এই চার বছর একাদিক্রমে গড়ে ৭.৫ শতাংশ বৃদ্ধির স্তরে ঘোরাফেরা করে। ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বরে ৫০০ ও ১০০০ টাকার বড়ো অঙ্কের

নোট বাতিল করে দেওয়ার পর পণ্ডিতরা আবার চুলচেরা বিশ্লেষণে বসে ঘোষণা করেছিলেন অর্থনীতির মুখ থুবড়ে পড়া ছাড়া পথ নেই। আশ্চর্য, ২০১৬-১৭-এর অর্থবর্ষেও অর্থনীতির অগ্রগতি ছিল দাপুটে ৮.২ শতাংশ।

অতীতের উদ্ধৃত অজস্র উদাহরণের মতোই অর্থনীতিতে মন্দার প্রভাব আবারও কিছুটা ফিরে এসেছে। বিগত চারটি ত্রৈমাসিকের জিডিপি হারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বৃদ্ধি গড়ে ৫.৫ শতাংশে নেমে এসেছে। এর মধ্যে আবার সর্বশেষ জুলাই সেপ্টেম্বর ত্রৈমাসিকে তা ৪.৫ শতাংশের নিম্নসীমা।

কাউকে অবাক না করে ঘাপটি মেরে থাকা নিরাশাবাদীরা আবার স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন। কেউ কেউ বলছেন ভারতে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছে। আরও বড়ো সুযোগসন্ধানীরা পরিস্থিতির ফয়দা তুলতে বলছেন হিসেবের পদ্ধতিতেই গড়বড় আছে। চুড়ান্ত অবিমৃশ্যকারিতার উদাহরণ রেখে বলছেন সঠিক পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের জিডিপি বৃদ্ধির হার এই চলতি নিম্নমুখিতার আগেও কখনই ৩.৫ শতাংশতে অতিক্রম করেনি। কেউ কেউ আবার সেই কেলেঙ্কারি আর চূড়ান্ত দুর্নীতিতে বোঝাই ইউপিএ-২ সরকারের আমলের কুকীর্তি ঢাকতে এই সুযোগে বলে বেড়াচ্ছেন যতই যা হোক না কেন অর্থনীতির বৃদ্ধি তো ৮ শতাংশের আশপাশেই ছিল। ২০১৩ সালের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিকের ৪.৩ শতাংশে নেমে আসাটা তাঁরা বেমালুম সুবিধেজনকভাবে ভুলে যাচ্ছেন।

অর্থনীতির চলাচলের আলোচিত এই দীর্ঘ ইতিহাসের গতি অনুধাবন করে আমরা একটু ভাবতে পারি যে মধ্যবর্তী ও দীর্ঘমেয়াদি স্তরে আমাদের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ কী হতে পারে। এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে অর্থনীতি একটি খারাপ অবস্থার মোড় অতিক্রম করছে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না এমন পরিস্থিতিতে আমরা অতীতেও বহুবার পড়েছি। তাই বলছি পণ্ডিত ভবিষ্যত দ্রষ্টাদের বিপদসঙ্কেতের বোতাম টেপার কোনো প্রয়োজন নেই।

অর্থনীতির এই শ্লথগতির মূল কারণ হচ্ছে ব্যাঙ্কগুলির অনুৎপাদক সম্পদকে (এনপিএ)-কে পরিষ্কার করা। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন পর্বে ব্যাঙ্কগুলির ব্যালেন্স শিট যেমন এনপিএ ঘোষণা ও তজ্জনিত ক্ষতির ফলে খারাপ হয়েছে। তারই প্রত্যক্ষ প্রভাবে ঋণগ্রহীতা সংস্থাগুলির B/S ও খারাপ হয়েছে। এটি স্বাভাবিক পারস্পরিক প্রভাব। ঋণ শোধ করতে না পারায় নতুন টাকা আসেনি। ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভালো খবর, ব্যাঙ্কের এই আবর্জনা দূরীকরণ প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে। ব্যাঙ্কের কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠছে (clean up process), একই সঙ্গে তাদের মূলধনী-সহ অন্যান্য শক্তি বাড়াতে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে ও নিচ্ছে। আমি নিশ্চিত করে বলছি, অর্থনৈতিক বৃদ্ধির গতি ফিরে আসা অবধারিত। তাই, এই মধ্যবর্তী সময়ে সরকার কিন্তু লক্ষভ্রষ্ট না হয়ে তার চালু করা করা অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রক্রিয়াগুলি পুরোদমে যেন চালিয়ে যায়। ■

রাষ্ট্রায় স্বাহা, রাষ্ট্রায় ইদং ন মম

গ্রাম বিকাশের জন্য একবছর সময় দান করুন

আমাদের সংস্থা গ্রাম বিকাশের দ্বারা গো-ভিত্তিক জৈবিক কৃষিকাজ, বর্ষার জল সংগ্রহের ডোবা খনন, বাড়ি বাড়ি তরিতরকারি ও ফলের বাগান তৈরি, গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট, গ্রামোদ্যোগের মাধ্যমে রোজগার ইত্যাদি গতিবিধি চলছে।

একটি গোরুর গোবর-গোমূত্র থেকে ৫ একর জমিতে কৃষিপদ্ধতি শেখানো, গ্রামীণ উৎপাদন বিক্রির ন্যায্যমূল্য পেতে সহযোগিতা করার কাজও গ্রামবিকাশের মাধ্যমে চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি গ্রামে এই জ্ঞান-আলোক পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রেমী, গো-প্রেমী, সেবা-ভাবী যুবক-যুবতীদের আহ্বান করা হচ্ছে, যারা বাড়ি ছেড়ে ন্যূনতম এক বছর সময় এই মহৎ কাজের জন্য দান করবেন।

এই বিষয়ে পথনির্দেশ, প্রশিক্ষণ ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা সংস্থার দ্বারা করা হবে। বয়সসীমা ৩৫-৫০ বছর।

সম্পর্ক সূত্র—

গো-গ্রাম বিকাশ

Mobile : 8100330044

E-mail : gosevaparivar@gmail.com

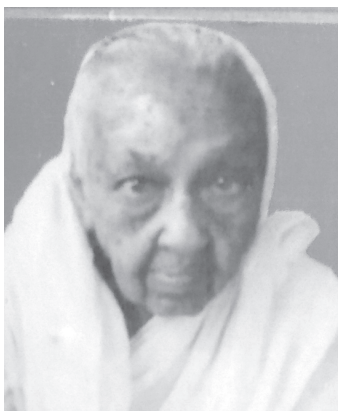

পরলোকে বীণাপাণি ঘোষ

গত ১৬ ডিসেম্বর, সোমবার বীণাপাণি ঘোষ হুগলী জেলার মাখাল্ডি গ্রামে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি দুই পুত্র ও ৪ কন্যা এবং পুত্রবধূ ও নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন। তাঁর দুই পুত্রই সঙ্ঘের প্রবীণ কার্যকর্তা। বস্তুত তাঁর পুরো পরিবারই সঙ্ঘময়। তাঁর মতো একজন মাতৃসমা-কে হারিয়ে স্বয়ংসেবকরা শোকাহত। শ্রীভগবানের কাছে তাঁর আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

রম্যরচনা

সুখী সংসার জীবনের রহস্য

একদিন এক ভদ্রলোক তাঁর অফিসের এক সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, আপনার সুখী সংসারজীবনের রহস্যটা কী? তা একটু বলবেন?' সহকর্মী উত্তরে বললেন, 'সংসারের দায়িত্বটা শ্রদ্ধা আর ভালোবাসার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী দুজনে শেয়ার করলে আর কোনও সমস্যা থাকে না।' ভদ্রলোকটি বললেন, 'আপনি ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলবেন?'

সহকর্মী : যেমন আমাদের সংসারে সব বড়ো বড়ো ব্যাপারে আমি সিদ্ধান্ত নিই, আর সব ছোটোখাটো ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় আমার স্ত্রী। আমরা কেউ কারও সিদ্ধান্তে নাক গলাই না।

ভদ্রলোক : আমি আপনার কথা সঠিক বুঝতে পারছি না, দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলুন না।

সহকর্মী : ছোটোখাটো বিষয় যেমন, কোন গাড়িটা কিনব, কত টাকা সঞ্চয় করব, সুপার মার্কেটে কখন যাব, কী রকমের সোফা, ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার কিনব, মাসের খরচ, কাজের লোক রাখব নাকি ইত্যাদি ছোটোখাটো ব্যাপারে আমার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নেন, আমি শুধু তাতে আমার সমর্থন জানিয়ে দিই। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে সংসারে আপনার ভূমিকাটা আসলে কী?'

ভদ্রলোক : আমার সিদ্ধান্ত থাকে সব বড়ো বড়ো ব্যাপার। যেমন ধরুন আমেরিকার ইরানকে আক্রমণ করা উচিত কি না, দেশে আলাদা রাজ্য সৃষ্টি হওয়া উচিত কি না, ভারতে বিজেপি শাসন কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে, ব্রাজিলে ফুটবল দলের কোচ কাকে বানানো উচিত ইত্যাদি। আমার স্ত্রী আমার এসব সিদ্ধান্তে কোনওদিন মাথা গলায় না।

উবাচ

"দিদি কাদের পক্ষে আর কাদের বিরোধিতা করছেন তা সবাই দেখছে। সংবিধান রক্ষায় শপথ নিয়ে এখন তিনি বলছেন মানবেন না।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

দিল্লিতে রামলীলা ময়দানের দলীয় সভায়

"চারদিন ধরে আগুন জ্বলল। কেন্দ্রের সম্পত্তি ধ্বংস হলো। কিন্তু রাজ্যের কোনো সম্পত্তির ওপর হামলা হলো না। তার মানে হামলাকারীরা সচেতন ছিল যাতে দিদির কোনো ক্ষতি না হয়।"

অধীর রঞ্জন চৌধুরী
কংগ্রেস নেতা তথা সাংসদ

বহরমপুরে এক পথসভায়

"সিএবি এবং এনআরসি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারত সরকার বার বার আমাদের আশ্বাস দিয়ে এসেছে যে, এটা একেবারেই তাদের ঘরোয়া ব্যাপার যা আইনি এবং আরও অন্যান্য কারণে বাস্তবায়িত করা হচ্ছে।"

এ কে আব্দুল মোমেন
বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী

ভারতে নাগরিকত্ব আইন রূপায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে

"রাজ্যে তাণ্ডব চালালেও একবারও হিংসার নিন্দা করলেন না মুখ্যমন্ত্রী। উলটে বললেন, শান্তি বজায় রাখার আবেদন করছি। মুখ্যমন্ত্রী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন না, আবেদন করেন।"

জে পি নাড্ডা
বিজেপির সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি

শ্যামবাজারে অভিনন্দন যাত্রার সমাবেশে

রাজ্য শাসনে রাজ্যপালের সক্রিয়তা সংবিধানসম্মত

ড. নির্মলেন্দুবিকাশ রক্ষিত

স্বাভাবিক অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসকপ্রধান। প্রখ্যাত আইনজ্ঞ জি. এন. যোশীর মতে, কিন্তু যদিও রাজ্যপালই আইনত রাজ্যের প্রধান শাসক, আসলে মুখ্যমন্ত্রীই the defacto head of the State–(দ্য কনস্টিটিউশন অব ইণ্ডিয়া, পৃ. ১৯১)। আমাদের সংবিধানের ১৫৪(১) নং অনুচ্ছেদ জানিয়েছে—'The executive power of the state shall be vested in the Governor,' বাস্তবে অনেক সময় মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে রেখে তাঁকে নেপথ্যে সরে যেতে হয়।

তার কারণ হলো আমরা ব্রিটেনের মতোই 'Westminster model' গ্রহণ করেছি। এক্ষেত্রে শাসকপ্রধান (রাজা/রানি) অনেকটা নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন, মন্ত্রীপ্রধানই শাসন বিষয়ে প্রাধান্য বিস্তার করেন।

এক্লিস্ট এইচ মরিস জোন্স্ লিখেছেন, কেন্দ্রে ও রাজ্যে 'ব্রিটিশ মডেল' গ্রহণ করা হলেও 'this cabinet system is reproduced in the units, but with some difference'– (গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৮০)।

সেই কারণে কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর যে ধরনের সম্পর্ক, রাজ্যের রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক ঠিক তেমনটা নয়। তার ফলে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা তুলনামূলকভাবে অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা মনে রাখতে হবে।

প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেটের কাজ হলো রাজ্যপালকে সাহায্য করা ও পরামর্শ দেওয়া (to guide and advise)। তাহলে মুখ্যমন্ত্রীই রাজ্যপালের মুখ্য সাহায্যকারী ও পরামর্শ দাতা। কিন্তু সংবিধানের কোথাও বলা হয়নি যে রাজ্যপাল সেই সাহায্য সর্বদা বা পরামর্শ নিতে বাধ্য।

কেন্দ্রেও এই ধরনের বাধ্যবাধ্যকতা ছিল না। কিন্তু ১৯৭৬ সালে সংবিধানের ৪২ তম সংবিধান সংশোধনী এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ওপর বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দিয়েছে—তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ এখন শুনতে বাধ্য। এই কারণে ডঃ বি. পি. রাউত জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি এখন 'rubber stamp' মাত্র—(ডেমোক্রাটিক কন্স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১২৯)। কিন্তু এই ধরনের কোনও সংবিধান সংশোধন রাজ্যপালের ক্ষেত্রে ঘটেনি।

দ্বিতীয়ত, ১৬৩(১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—রাজ্যপাল যেসব ক্ষেত্রে তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না, সেই সব ক্ষেত্রেই মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে পরামর্শ দেবেন। সুতরাং একটা বিশাল ক্ষেত্রে রাজ্যপাল তাঁর ক্ষমতা বিস্তার করতে পারেন—বিশেষ করে ১৬৩(২) নং অনুচ্ছেদে সংবিধান বিষয়টা তাঁর নিজের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে। এই অনির্দিষ্ট ক্ষেত্রটাই রাজ্যপালের প্রক্রিয়ার জায়গা হতে পারে। ড. এম. ভি. পাইলী মনে করেন, রাজ্যপাল নিম্নলিখিত বিষয়ে তাঁর একক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেই পারেন—(১) মুখ্যমন্ত্রীর নিয়োগ; (২) মুখ্যমন্ত্রীর পদচ্যুতি; (৩) বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান; (৪) বিধানসভা ভাঙা; (৫) ক্যাবিনেট লিখিত অভিভাষণের কোনও অংশ বর্জন; (৬) বিলে ভেটো দেওয়া এবং সেটা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো; (৭) রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করা ইত্যাদি। সেক্ষেত্রে তাঁকে নিছক কলের পুতুল বলা যায় না। ড. এম. ভি. পাইলী তাই মন্তব্য করেছেন, 'the Governor is not a mere figurehead', বরং তিনি রাজ্য শাসনে একটা 'vital role' পালন করতে পারেন (অ্যান ইন্ট্রোডাক্শান টু দ্য কন্স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২৪৪)। আর প্রখ্যাত সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু মনে করেন তিনি অন্যান্য বহু বিষয়েও তাঁর নিজস্ব ক্ষমতা দাবি করতে পারেন। সেটা নির্ভর করে 'according to circumstances' (ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্স্টিটিউশন অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২১০)।

তৃতীয়ত, রাজ্যপালকে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পরামর্শ শুনতে বাধ্য করতে পারেন না। তার কারণ হলো, কার্যভার গ্রহণের সময় রাজ্যপাল ঈশ্বরের নামে (in the name of God) অথবা নিজের বিবেকের কাছে শপথ নেন তিনি সংবিধান ও আইন রক্ষা (preserve, protest and defend the constitution and the laws) করবেন এবং রাজ্যবাসীর কল্যাণের (well being) দিকে লক্ষ্য রাখবেন। সুতরাং তাঁর দায়বদ্ধতা সংবিধান, আইন ও জনকল্যাণের দিকেই থাকবে। যদি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ ভিন্নধর্মী হয়, তাহলে রাজ্যপাল সেটা নিশ্চয় অগ্রাহ্য করতে পারেন বিবেকের টানে বা জনস্বার্থে।

চতুর্থত, মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে তাঁকে পদচ্যুত করার ব্যবস্থাও নিতে পারেন না। কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সংবিধানের ৬১নং অনুচ্ছেদে আছে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী সংসদে 'ইম্পিচ্মেন্ট' প্রস্তাব আনতে পারেন। কিন্তু রাজ্যপালকে সরাতে পারেন একমাত্র রাষ্ট্রপতিই—১৬৪(১) নং অনুচ্ছেদ

অন্য কাউকে এই ধরনের ক্ষমতা দেয়নি।

এইসব কারণে বলা যায় রাজ্যপাল আদৌ মুখ্যমন্ত্রীর দাসানুদাস নন। সংবিধান তাঁকে বিশেষ একটা স্থান দিয়েছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা সক্রিয়ও হতে পারেন।

মনে রাখা দরকার, ব্রিটেনের ব্যবস্থা রাজা/রানির ক্ষমতা ক্রমে খর্ব করলেও তাঁরা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে যাননি। ওয়াল্টার বেজহট লিখেছেন, তাঁদের তিনটি অলিখিত ক্ষমতা আছে—(১) উৎসাহ দেওয়া, (২) তথ্য জানা ও (৩) সতর্ক করা। এই 'informal rights' দিয়েই তাঁরা পাদপ্রদীপের নীচে মাঝে মাঝে আসেন। লুই নেপোলিয়ান 'ক্যু'-র মাধ্যমে ফ্রান্সে ক্ষমতায় বসলে ব্রিটেনের বিদেশমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। তাতে রানি ভিক্টোরিয়া তাঁকে বলেন, তাঁর পরামর্শ না নিয়ে কাজটি করা উচিত হয়নি। ১৮৫৭ সালে ভারতে মহা বিদ্রোহ হলে (পামারস্টোন তখন প্রধানমন্ত্রী) তাঁকে অসর্তকতার কারণে রানি তিরস্কার করেছেন (ডঃ বি. বি. মজুমদার—রাইজ অ্যান্ড ডেভেলাপ্‌মেন্ট অব দ্য ইংলিশ কন্‌স্টিটিউশান, পৃ. ৩৫৭)। স্যার আইভর জেনিংস্ তাই লিখেছেন—'She may not after the ship, but she must make certain that there is a man on the wheel'–(দ্য কুইন্‌স্ গভর্নমেন্ট, পৃ. ৩৫)।

তাহলে আমাদের রাজ্যপাল এক কাটা সৈনিক? এফ. এল. সিক্রি সঙ্গত কারণেই মন্তব্য করেছেন, রাজ্যপাল আদৌ 'decorative emblem' নন (ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্স, পৃঃ ২৩৬)। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে পরামর্শ দিতে পারেন—কিন্তু রাজ্যপালও তাঁকে সমালোচনা করতে পারেন। ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। প্রয়োজনে তথ্য জানতে চাইতে পারেন। যে কোনোও অফিসারকে ডাকতে পারেন, দরকারে কোনো ঘটনাস্থলেও যেতে পারেন।

এগুলো বিরোধী নেতার ভূমিকা নেওয়া বা অতি সক্রিয়তা বা ক্ষমতার রেখা অতিক্রম করা নয়। কোনোও সংবিধান গ্রন্থের মলাট না খুলেই সংবিধান বিশেষজ্ঞ সাজাটা মূর্খতাকেই কিন্তু প্রকট করে তোলে। কিন্তু এ কথা মনে রাখতেই হবে—প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রীর কার্যকাল রাজ্যপালের ওপর নির্ভর করে। কারণ ১৬৪(১) নং অনুচ্ছেদে আছে 'Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor। মুখ্যমন্ত্রীও একজন 'Minister', সুতরাং তাঁর ওপর থেকেও pleasure তুলে নেওয়া যায়। এভাবেই ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ধর্মবীর মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিকে বরখাস্ত করেছিলেন এবং হাইকোর্টের মতে, সেটা ছিল বৈধ ব্যাপার (শর্মা বনাম ঘোষ)।

দ্বিতীয়ত, মুখ্যমন্ত্রীর দলে ভাঙনের ফলে তাঁর গরিষ্ঠতা নিয়ে রাজ্যপালের মনে সন্দেহ দেখা দিলে তিনি তাঁকে বিধানসভায় শক্তিপরীক্ষা দেওয়ার কথা বলতে পারেন। (ড. এ. সি. কাপুর—দ্য ইন্ডিয়ান পলিটিক্যাল সিস্টেম, পৃঃ ৩৫৩)। ধর্মবীর এটাও করেছিলেন।

তৃতীয়ত, রাজ্যপালের অভিভাষণ মুখ্যমন্ত্রী তথা ক্যাবিনেটের লেখা। ১৯৬৯ সালে অজয়বাবুরা ক্ষমতায় ফিরে এসে অভিভাষণে রাজ্যপালের নিন্দায় দুটো প্যারা রেখেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল, ব্রিটিশ প্রজা অনুসারে রাজ্যপাল সবটাই পড়তে বাধ্য। কিন্তু তিনি জানতেন না যে, এক্ষেত্রে আরও একটা প্রথা আছে—রাজা/রানির নিন্দা তাতে থাকতে পারে না, কারণ তারাই সেটা পড়েন।

চতুর্থত, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ ছাড়াই রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দিতে পারেন। কারণ ব্রিটেনেও রাজা/রানির 'prerogative power'। জি. এম. পাণ্ডের মতে এটা রাজ্যপালের একক ক্ষমতা।

পঞ্চমত, রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার (৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ) ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণ এটা মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থার প্রতীক।

ষষ্ঠত, রাজ্যপাল রাজ্য বিলে ভেটো দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতির কাছেও পাঠাতে পারেন। ১৯৫৯ সালে এই পশ্চিমবঙ্গেই এমনটা হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য শাসনে সর্বেসর্বা নন, তাঁর ক্ষমতাও সীমিত। তবে তিনি রাজ্যপালের প্রধান সহকর্মী ও উপদেষ্টা। তাছাড়া তিনি ক্যাবিনেটের প্রধান 'Cheaf head' (১৬৩(১) নং অনুচ্ছেদ)। তাঁর কথাতেই অন্যান্য মন্ত্রীরা নিযুক্ত হন এবং পদচ্যুত হতে পারেন। তিনিই রাজ্যপাল ও ক্যাবিনেটের মধ্যে সংযোগ সেতু। তিনি বিধানমণ্ডল ও তাঁর দলের নেতা/নেত্রী।

তবে অনেক কিছুই নির্ভর করে তাঁর ব্যক্তিত্ব, জনপ্রিয়তা ও দলীয় অবস্থার ওপর (ড. বি. ডি. বাহাদুর—দ্য কন্‌স্টিটিশান অব ইন্ডিয়া, পৃঃ ২৩৩)। সংবিধান বড়ো কথা নয়, আসলটা হলো অন্য কিছু বিষয়। রাজ্যপাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে এবং মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রের বিরূপভাজন হলে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা নিষ্প্রভ হতে পারেন---(ড. এইচ. এইচ. দাস—ইন্ডিয়া, পৃঃ ২৭২)। তাছাড়া তার দলের মধ্যে কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেতা থাকলেও তাঁর অশান্তি ঘটতে পারে। ১৯৪৮ সালে দলীয় কোন্দলের ফলেই মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। এক সময় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ড. সম্পূর্ণানন্দকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন দলীয় সভাপতি চন্দ্রভান গুপ্তা।

ড. জে. সি. জোহারী লিখেছেন—মুখ্যমন্ত্রীর দল একক গরিষ্ঠতা পেলে তাঁর ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু বৃহত্তর দল অন্য দলের সমর্থন নিলে মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতা খর্ব হয়। আর তিনি কোয়ালিশান সরকার গড়লে তিনি হন 'a prisoner of circumstances'–(ইন্ডিয়ান পলিটিকাল, পৃঃ ৩৬৮)।

সুতরাং এই ব্যাপারে এক নিঃশ্বাসে শেষ কথা বলা যায় না। একটা ব্যাপার হলো মুখ্যমন্ত্রীর কথায় বা ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তে কিছু হয় না। দরকার রাজ্যপালের সম্মতি (ডঃ এস. সি. কাশ্যপ---আওয়ার কন্‌স্টিটিউশান, পৃঃ ২৬৩)। তাছাড়া কেন্দ্রের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক, বিধানসভায় দলীয় অবস্থা, মুখ্যমন্ত্রীর দলের সহতি, তাঁর দলের ওপর তাঁর আধিপত্য, দলীয় সভাপতির সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদিও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। বিধানচন্দ্র রায় এবং অজয় মুখার্জিকে একই সারিতে রাখা যায় না। মোরারজী দেশাই এবং রাবড়ি দেবীও এক নন। ■

মাননীয়া ও ডাক্তারবাবুর ষড়যন্ত্র

দীপ্তিমান সেনগুপ্ত

গত ১৫ ডিসেম্বর সিপিএম নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী ডা: সূর্যকান্ত মিশ্র এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, 'এনপিআর, যেটা এনআরসি-র আগে করতে হয় সেটা নাকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই রাজ্যে শুরু করার জন্য নির্দেশিকা জারি করেছেন এবং বিজেপির সঙ্গে তাল মিলিয়ে করছেন।' ঠিক তার একদিন পরেই সেই নির্দেশিকা হঠাৎ করেই ১৬ তারিখ তুলে নেওয়া হয়। এটা ভেবে অবাক হইনি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটা তুলে নিয়েছে, অবাক হলাম এটা ভেবে যে মুখ্যমন্ত্রী এখন ওই ডাক্তারবাবুর কথা মতো কাজ করছেন... !

২০১১ সালে জানুয়ারিতে ভারতের সর্বশেষ জনগণনার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। জনগণনার রিপোর্ট বলেছি কিন্তু রিপোর্ট তৈরি বলিনি। কারণ দুটো আলাদা আলাদা পর্যায়ের রিপোর্ট তৈরি করতে প্রায় এক বছর সময় লাগে। তালিকায় নাম তুলতে হয়তো ১৫/২০ দিন লাগে কিন্তু তার বিভিন্ন স্তরের প্রস্তুতি করতে লাগে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় মাস আর নাম সংগ্রহের পরে সেটা মিলিয়ে পাঠাতে লাগে আরও প্রায় তিন চার মাস। আর এতে খরচ হয় কয়েক হাজার কোটি টাকা। আর সেই টাকা দেয় অর্থ মন্ত্রক। তাই রেজিস্ট্রার জেনারেল অব সেন্সাসকে বার্ষিক বাজেট পেশের আগেই আনুমানিক খরচের হিসেব জমা দিতে হয়, আর জাতীয় বাজেট ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যেই শেষ করতে হয়।

২০১১ সালের জনগণনার একটা ঘটনা বলছি। ২০১০ সালের শুরুর দিকে, আমি তখন ছিটমহল বিনিময় আন্দোলনের সর্বক্ষণের কার্যকর্তা। কোচবিহারের জেলাশাসক তখন স্মারকী মহাপাত্র। ফেব্রুয়ারি মাসে একটা ডেপুটেশনের দিতে জেলা শাসকের দপ্তরে কয়েক হাজার ছিটমহলের বাসিন্দার সঙ্গে গেছি। ডেপুটেশনের পরে ভীষণ অপ্রাসঙ্গিক ভাবে জেলা শাসক জিজ্ঞেস করলেন দু'পাশের (ভারত ও বাংলাদেশ) সব ছিটমহল মিলে মোট লোকসংখ্যা কত হতে পারে? আমি বললাম আমার কাছে সঠিক হিসেব নেই তবে পঞ্চাশ হাজারের কম হবে না। তিনি বললেন আমাকে এর একটা সঠিক হিসেব দিতে পারবেন? আমি কিছু না বুঝেই বললাম হ্যাঁ পারবো।

ফিরে এসে ভাবছিলাম যে কার কাছে সাহায্য নেবো, ঠিক তখনই ইংল্যান্ডের ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গবেষক ছিটমহলের বিষয়ে গবেষণা করার জন্যে একজন সাংবাদিকের মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ঈশ্বর যেন নিজেই নিয়ে এসেছেন। তার সঙ্গে আমার প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টার আলোচনা শেষে আমরা একটা প্রোফর্মা তৈরি করে সেই মতোই পরদিন থেকে কাজ শুরু করি। নিজের শখের একটা মহেন্দ্র পিজোট্ জিপ আর আমার স্ত্রীর প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে তিন লক্ষ টাকা ধার নিয়ে চার মাসের কঠিন পরিশ্রমের পরে একটা হিসেব আসে ৪৯৫৪৮ জন মানুষের। ২০১০ সালের ২৭ জুন প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে আবার কয়েক হাজার মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সেই হিসেব জেলা শাসকের হাতে তুলে দিয়ে আসি। যা পরবর্তীতে ২০১১ সালে ১৪ থেকে ১৭ জুলাই সরকারি জনগণনাতে গিয়ে দাঁড়ায় ৪৯৫৮৩ জন। এর কিছুদিন পরেই একটা ছোট্ট খবর পাই যে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন জেলা শাসককে সেন্সাস জেনারেল দিল্লিতে ডেকেছেন তার মধ্যে কোচবিহারের জেলাশাসকও আছেন। পরে অসমর্থিত সূত্রে জানতে পারি ওই হিসেবটা উপরে পাঠানোর ফলেই তাঁকে ডাকা হয়েছিল, কারণ এটাও একটা সাংবিধানিক সংকট ছিল।

এবার প্রসঙ্গে ফিরে আসি, ভারতের এই জনগণনার রিপোর্ট কখনোই কোনো অঙ্গ রাজ্য বাদ দিয়ে হতে পারে না। তাই পশ্চিবঙ্গ সরকার যদি এই প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু না করে তবে সাংবিধানিক সংকট নিরসনের জন্যই রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে হবে, আর ঠিক তখনই ডাক্তারবাবুর দল, মাননীয়ার দল-সহ সব শেয়াল এক সঙ্গে চিৎকার করে বলবে ''ওই দেখুন বিজেপি তার ফ্যাসিস্ট রূপ নিয়েছে'' আর ডাক্তারবাবুরা বলবেন, ''এই কারণেই আমরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে হলেও বিজেপিকে আটকাতেই সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি একসঙ্গে লড়াই করবো।'' এটা একটা অনেক বড়ো ষড়যন্ত্রের সবে শুরু করলেন ডাক্তারবাবু ও মাননীয়া। আসলে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা একসঙ্গে হয়েও কিছুই করতে পারবে না, বরং অবৈধ অনুপ্রবেশকারী ভোটাদের যেন ভাগ না হয় তার প্রক্রিয়া শুরু করলেন আর তাদের (কংগ্রেস ও বামপন্থী) সম্মিলিত যে ৮/১০ শতাংশ ভোট আছে তা যদি তৃণমূলকে দিয়ে কোনো মতে কয়েকটি পৌরসভা আর বিধানসভার আসন পাওয়া যায় তবে অস্তিত্ব টিকে যাবে। নীতি, আদর্শ কিংবা পশ্চিমবঙ্গের কথা ভাবার তাদের দরকার নেই। এই জনগণনার কাজটা আটকে দিয়ে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি করতে পারলেই তারা প্রচার শুরু করবে, যেভাবে জোর করে নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করেছে ঠিক সেভাবেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির সংরক্ষণ তুলে দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ চালু করছে বিজেপি। এসব মিথ্যে প্রচার করতে তারা যথেষ্ট পটু এবং এভাবেই হিন্দু বাঙ্গালিকে আবার তাৎক্ষণিক ভাবে দেশভাগের ইতিহাস ভুলিয়ে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানানোর প্রক্রিয়াকে সম্পন্ন করতে চাইছে। আর আমরা হিন্দু বাঙ্গালিরা মহম্মদ সেলিমের ধুতি আর মাননীয়ার শাড়ি দেখে এই আনন্দেই আত্মহারা থাকবো যে এই বেশ ভালো আছি। আমরা একবারের জন্যেও ভাববো না যে শ্যামাপ্রসাদের জন্যই আজকেও আমরা বেঁচে আছি বা জেহাদি হইনি। এটাই আমাদের ইতিহাস। তাই এখন হিন্দু বাঙ্গালিকে শুধুমাত্র বিজেপির ভোট চাওয়ার জন্য পথে নামলে হবে না, ভারতের সংবিধান ও সাংবিধানিক সংস্থার অধিকার রক্ষার জন্যেও পথে নামতে হবে। সনাতন ভারতে কেউ উচ্ছিষ্ট ছিল না, সর্বধর্ম সমন্বয় কিংবা অতিথি সেবা আমাদের কাছে ঈশ্বরের তপস্যা কিন্তু অস্মিতা রক্ষা করার খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা বুদ্ধিমান হিন্দু বাঙ্গালি যদি এই মুহূর্ত থেকে নিজের জ্ঞান, বিচার বুদ্ধি ও অধিকার প্রয়োগ না করে তবে টোটোপাড়ার বিলুপ্তপ্রায় টোটো জনজাতির মতো সংরক্ষিত জীবনযাপন করতে হবে অথবা বিলুপ্ত হয়ে যেতে হবে।

(লেখক ছিটমহল বিনিময় সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক)

শরণার্থী ও উদ্বাস্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সিএএ ২০১৯-এর ভূমিকা

সুদীপ সিকদার

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট মধ্যরাত্রে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কণ্ঠে ঘোষিত হলো ভারতের স্বাধীনতা। ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়া ভারতবর্ষ ভাগ হলো দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। ১০০০০ বছরেরও বেশি সময়ের সাক্ষী আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ তার অতীতের অস্তিত্ব হারিয়ে দ্বিখণ্ডিত হলো ভারত ও পাকিস্তানে। সেদিন জাতিসত্তার নতুন সংজ্ঞা নিরূপিত হয়েছিল মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও তার মুসলিম লিগের রাজনৈতিক দর্শনের ভেতর দিয়ে। আধুনিক জাতিসত্তার জনক আর্নেস্ট রেনানের সংজ্ঞা সেদিন পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। আর্নেস্ট রেনান বলেছিলেন, "একই সভ্যতা-সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, আনুভূমিক ভাষা এবং জীবনধারার সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর কল্পিত ভূখণ্ডের সমষ্টিগত আত্মপ্রকাশের নাম হলো জাতি"। সেখানে নতুন করে ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটল। সিন্ধুসভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতার জননী ভারতবর্ষে সেদিন ভাগ হয়ে গিয়েছিল উগ্র ইসলামি ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ রাজনৈতিক মতবাদে। মাত্র ২৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী সেদিন ২৬ শতাংশ ভূখণ্ড নিয়ে গড়ে তুলেছিল তাদের কাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান। পাকিস্থান অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য পবিত্র ভূমি। আর তাদের তথাকথিত বিদ্বেষ ভূমি যা আমাদের কাছে পবিত্র হিন্দুস্থান বা ভারতবর্ষ, আপামর ভারতবাসীর ভারতমাতা।

৭১২ সালে মহম্মদ বিন কাসেম সিন্ধু প্রদেশের রাজা দাহিরকে পরাজিত করার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর পেরিয়ে গেছে। দীর্ঘ প্রায় তেরোশো বছর একই ভূমিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম একসঙ্গে বসবাসের পরেও যারা ভারতীয় জাতিসত্তায় লীন হতে পারলেন না, যারা ধর্মীয় ভাবধারা এবং বিশ্বাসের মধ্যে জাতিসত্তার খোঁজ পেলেন তা বোধহয় ইতিহাসের লজ্জা মানব সভ্যতার লজ্জা। আর এই ভারত ভাগের পর থেকেই শুরু হলো উদ্বাস্তু শরণার্থী শ্রেণীর আবির্ভাব। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে শুরু হলো সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, পারসি জনগোষ্ঠীর নিজ দেশ ত্যাগ করে ভারত ভূমিতে আশ্রয়ের অধ্যায়। যেহেতু ওটা পাক ভূমি, সুতরাং সেখানে অপাক (অমুসলিম) জনগোষ্ঠীরা ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংবিধানিক ভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ঘোষিত হলো। যদিও তৎকালীন পাকিস্তানে হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ২২.২৩ শতাংশের কাছাকাছি এবং পূর্ব পাকিস্তানের সেটা ২৮ শতাংশের কাছাকাছি যা আজকে পাকিস্তানে ১.৭৮ শতাংশ আর পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে ৮ শতাংশেরর কম। কিন্তু কোথায় গেল পাকিস্তান এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু এবং শিখ সম্প্রদায়ের মানুষেরা? এই হারিয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠীর একটা বিরাট অংশ আজ ভারতবর্ষে উদ্বাস্তু তথা শরণার্থী। সংখ্যাগুরু মুসলমান জনগোষ্ঠীর সামাজিক রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ভাবাবেগের পীড়নজনিত কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ তারা মান-সম্ভ্রম ভিটেমাটি সম্পত্তি হারিয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে শুরু করে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলিয়ে ২১২টি দাঙ্গা সংঘটিত হয়। এই প্রলয়ংকারী দাঙ্গার সমাধান হিসেবে ১৯৫০ সালের ৮ এপ্রিল নেহরু লিয়াকত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বলা হয় দুটি দেশ ভারত ও পাকিস্তান নিজ নিজ দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক নিরাপত্তা দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যার পূর্ণমাত্রিক ব্যবহার হয়েছিল ভারতে এবং ভারতীয় সংবিধান সে ক্ষেত্রে অভিভাবকের ভূমিকা পালন

করেছিল। পক্ষান্তরে পাকিস্তানে তখনো বিধিবদ্ধ সংবিধান রচিত হয়নি। চৌধুরী মহম্মদ আলি তখন সবেমাত্র পাকিস্তান সংবিধানে তৈরির খসড়া নির্মাণে ব্যস্ত যা পরবর্তীকালে ১৯৫৬ সালে সাংবিধানিকভাবে গৃহীত হয়। অর্থাৎ একটা সংবিধান বিহীন দেশের সঙ্গে সেদিন নেহরু-লিয়াকত চুক্তি হয়েছিল যা সাংবিধানিকভাবে পাকিস্তানে প্রয়োগযোগ্য ছিল না। তাহলে এই ঐতিহাসিক ভুল কি পণ্ডিত নেহরুর রাজনৈতিক অপরিপক্কতা না অপরিণামদর্শিতা? নাকি তিনি পাকিস্তানে থাকা হিন্দু এবং শিখদের চিরকালের জন্য বিসর্জন দেওয়ার আইনি বন্দোবস্ত করেছিলেন? পাকিস্তানে নেহরু-লিয়াকত চুক্তি কার্যকর না হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে মানুষ অসম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে আসতে শুরু করল আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এসে আশ্রয় নিল পঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল, উত্তরপ্রদেশ ও কাশ্মীরে। একথা উল্লেখ করা দরকার কেবলমাত্র কাশ্মীরে আশ্রয় নেওয়া হিন্দু এবং শিখরা ৩৭০ ধারার কারণে পাকিস্তান ত্যাগের পরেও ভারতের নাগরিকত্ব পাননি এবং কেবলমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণী বসবাসকারী নাগরিকে পরিণত হন। প্রমাণস্বরূপ বাল্মীকি সম্প্রদায় ও জম্মু-কাশ্মীর সরকার মামলা দ্রষ্টব্য।

সিএবি-২০১৯ পাশের মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত কোটি কোটি উদ্বাস্তু মানুষদের সাংবিধানিকভাবে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের আইনি ব্যবস্থা করা হয়। এই সিএবি পাশের মধ্য দিয়ে বিগত ৭২ বছরের উদ্বাস্তু এবং শরণার্থী (হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন এবং পার্সি) সমস্যার স্থায়ী সমাধান হলো। ইউএন হাই কমিশান ফর রিফিউজি ১৯৫১ গাইডলাইন অনুযায়ী ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ভাবে অত্যাচারিত, শোষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, প্রকৃতপক্ষে সর্বহারা নির্যাতিত মানুষদের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার নিঃশর্ত নাগরিকত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান অখণ্ড ভারতবর্ষের অঙ্গ ছিল। তাই ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং প্রজন্মগত দায়বদ্ধতা থেকেই এই তিন দেশের সংখ্যালঘু ৬টি সম্প্রদায়ের মানুষকে নাগরিকত্ব দেওয়ার ভাবনা। এক্ষেত্রে মুসলমানদের কথা ভাবার প্রয়োজন নেই এজন্য যে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের অংশ তারা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান আদায়ের মাধ্যমে পেয়ে গেছে, উপরন্তু এই সকল দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর অত্যাচারের ফলে যারা বাস্তুচ্যুত হয়ে শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হলো সেই অত্যাচারীদের পুনরায় ভারত ভূমিতে নাগরিক হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো মানবিকতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। যদিও বর্তমানে কিছু তথাকথিত মুখোশধারী অতি উদারবাদী দল মানুষকে ভুল বোঝাবার জন্য কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে চলেছেন। আসলে এরা বিদেশি মদতদাতা শক্তির স্টাইপেন্ড পাওয়া রাজনৈতিক দল ও বুদ্ধিজীবী। এই সমস্ত দল যে পেট্রোডলার মদতপুষ্ট আর পাকিস্তানি রাজনৈতিক দর্শনে চালিত হয় তা ক্যাব ২০১৯ পাশের পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় প্রমাণিত। যেখানে সংসদে দাঁড়িয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পরিষ্কার বলেছেন ১৯৪৭-এর পর ভারতে আসা মুসলমান এবং তাদের বংশধরেরা ভারতের নাগরিক সেখানে উলুবেড়িয়া, বেলডাঙ্গা, মালদা, শিলিগুড়ি, বীরভূম, ভালুকা, সল্টলেক, কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় রেলস্টেশন ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, চলন্ত ট্রেনে পাথর ছুড়ে মানুষকে হত্যা করার চেষ্টা চালানো লুটপাট চালানো এই অপচেষ্টাকারীরা কারা? কী তাদের পরিচয়? কোন রাজনৈতিক শক্তি এদের পিছনে? রাজ্য প্রশাসন কেন এখনো নিশ্চুপ? রাজ্য সরকার ঠিক কী চাইছে? সরকারি সম্পত্তি জ্বালিয়ে নিরীহ যাত্রীদের আহত করে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে? বর্তমান রাজ্য সরকার একটি সাংবিধানিক আইনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে পরোক্ষভাবে উগ্রপন্থাকে ইন্ধন দিচ্ছে--- এ তো সংবিধানবিরোধী কার্যকলাপ। আর সিটিজেনশিপ আমেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ২০১৯ তো শরণার্থীদের নাগরিকত্বের কথা বলছে, কারো নাগরিকত্ব হরণের কথা বলছে না। তাহলে পশ্চিমবঙ্গের বিশেষ বিশেষ জায়গায় কেন এই পাথরবাজি? সেই কাশ্মীরের পাথর ছোড়া বাহিনী যারা ভারত সরকারের দেওয়া (৩৭০ ধারা) সস্তা রেশনের চাল-ডাল- তেল-লবণ খেয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে পাথর ছুড়ে মারতো তারা কি এখন পশ্চিমবঙ্গেও সক্রিয় হয়ে উঠেছে? এখন ভাবার সময় এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতেও তাদের নতুন কলেবরে উৎসাহিত করে তুলছে। তিনি বলছেন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে একটা নির্দিষ্ট দাবি থাকে। এদের দাবি কী? কোন সে দাবিতে তারা পাথরবৃষ্টি, অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর, ভীতি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে জনজীবন অচল করে তুলছে? সিএবি পাশের মধ্য দিয়ে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী উদ্বাস্তু মানুষকে আশ্রয় এবং নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছে এটা কি অপরাধ? উত্তর দেবেন কি মাননীয়া?

গত তিনদিনের ধ্বংসাত্মক আন্দোলনে এ পর্যন্ত ১৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা মূল্যের সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হয়েছে তার দায়ভার নিচ্ছেন তো? স্মরণে রাখা দরকার, যা ধ্বংস করা হলো তা জনগণের প্রদত্ত করের টাকায় রাষ্ট্রীয় সম্পদ। মননীয়াকে জিজ্ঞাস্য আপনি কি এই কোটি কোটি উদ্বাস্তু শরণার্থী মানুষকে নাগরিকত্বের স্থায়ী সমাধান চান না? শুধু মিথ্যা অপপ্রচারের মধ্য দিয়ে তাদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার ও হিংসাশ্রয়ী আন্দোলনের নামে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আঘাত করা কি আপনার রাজনৈতিক দর্শন? নাকি নতুন করে আরেকটি পাকিস্তান কিংবা মুঘলস্থান তৈরির স্বপ্নে মশগুল হিংসাশ্রয়ী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আপনিও গোপন ষড়যন্ত্রে শামিল? তবে মনে রাখা দরকার, পশ্চিমবঙ্গের মাটি মহান দেশপ্রেমিক ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্মবলিদানের ফসল। আর প্রাণের বিনিময়ে হলেও আমরা ড. শ্যামাপ্রসাদের আত্মবেদী রক্ষা করব। শ্যামাপ্রসাদের রক্তস্নাত পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে জিন্নাবাদীদের উত্থান রাজ্যের মানুষ মানছে না, মানবে না। শুভবুদ্ধি সম্পন্ন পশ্চিমবঙ্গে মানুষ আগামীতে তার জবাব দেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভেতর দিয়েই। ■

নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নাগরিকত্ব আইনকে রদ করা যাবে না

সাধন কুমার পাল

সরকারি অর্থে বিজ্ঞাপন দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার করছেন তিনি পশ্চিমবঙ্গে এন আর সি ও নাগরিকত্ব আইন লাগু হতে দেবেন না। মেঠো রাজনীতিতে তিনি এরকম হুঙ্কার ছাড়তেই পারেন। কারণ রাজনীতির ময়দানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা খুশি তাই বলার পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এ ব্যাপারে সংবিধান কী বলছে? সংবিধান নাগরিকত্ব, প্রতিরক্ষা এই সমস্ত ব্যাপারে কোনোরকম সিদ্ধান্ত ও তা কার্যকর করার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারকেই দিয়েছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রের নির্দেশ রাজ্য সরকার লাগু করতে বাধ্য। সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও অষ্টম লোকসভার সেক্রেটারি সুভাষ কাশ্যপের মতে সংবিধানের ১১ নম্বর ধারায় স্পষ্ট করে বলা রয়েছে যে নাগরিকত্ব ও এই সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় সংসদের এক্তিয়ারে পড়ে। আইন তৈরি করতে পারে একমাত্র সংসদ। এ ক্ষেত্রে রাজ্যের কোনো ক্ষমতাই নেই। আইন তৈরি হয়ে গেলে সেই আইন না মানার কোনো অধিকারই নেই রাজ্যের। নাগরিকত্ব আইন লাগু করতেই হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। সংসদে পাশ হওয়া এই আইন বলবৎ করার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রের। রাজ্যসরকার এই আইন লাগু করতে অস্বীকার করলে জারি হতে পারে রাষ্ট্রপতি শাসন। লোকসভা ও দিল্লি বিধানসভার প্রাক্তন সচিব এস কে শর্মাও একই অভিমত পোষণ করেন।

নাগরিকত্ব আইন বলবৎ করা নিয়ে সুভাষ কাশ্যপ আরও বলেন সংসদ আইন পাশ করলেও তা কার্যকর করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। এখন রাজ্য যদি তা না করে তাহলে তা সংবিধান ভঙ্গ করার শামিল। সংবিধান ভঙ্গ হলে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে পারে। কোনো রাজ্যের যদি এই আইন বলবৎ করতে আপত্তি থাকে তা হলে দুটি পথ খোলা রয়েছে। এক, সুপ্রিম কোর্টে যাওয়া এবং নিজেদের বক্তব্য কোর্টকে জানানো। দুই, আইন তৈরি হওয়ার আগে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখিয়ে সেটিকে আটকে দেওয়া।

প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ অমল কুমার মুখোপাধ্যায় মনে করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রণিত আইন কার্যকর না করলে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা যেতে পারে। সংবিধানের ২৫৬ ধারা বলছে, রাজ্য সরকার তার প্রশাসনিক ক্ষমতা এমনভাবে প্রয়োগ করবে, যাতে তা কেন্দ্রীয় সরকারের আইনের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। কোথাও কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ালে কেন্দ্র এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে নির্দেশও

দিতে পারে। সংবিধানের ৩৬৫ ধারায় বলা হয়েছে, যদি কেন্দ্রের দেওয়া এই নির্দেশ রাজ্য সরকার না মানে, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সাংবিধানিক অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে পারে। এব্যাপারে সিপিএমের তাত্ত্বিক নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের মত হলো, রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় আইনটি কার্যকর করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করতেই পারে। কেন্দ্রীয় আইন কার্যকর করার ব্যাপারে রাজ্যের মেশিনারি ব্যবহার করা হয়। রাজ্য সরকারের অফিসাররা এই ব্যাপারে কাজ না করলে কারো কিছু করার নেই। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যদি রাজ্যকে এই আইনটি কার্যকর করার ব্যাপারে নির্দেশ দেয়, সেক্ষেত্রে তা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। সংবিধান বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে গর্জানো সহজ হলেও বর্ষানো অসম্ভব।

ভারতের নাগরিকত্ব আইনের ১৪ নং ধারায় স্পষ্ট করে নাগরিক পঞ্জিকরণের (এনআরসি) ব্যাপারে বলা হয়েছে। [14A, Issue of national Identity cards–(1) The Central Government may compulsorily register every citizen of India and issue national identity card to him.

(2) The Central Government may maintain a National Register of Indian citizens and for that purpose establish a National Registration Authority.

(3) On and from the date of commencement of Citizenship (amendment) act 2003 (6 of 2004), the Register General of India appointed under sub-section (1) of section 3 of the registration of births and deaths Act, 1969 (18 of 1969) shall act as National Registration Authority and he shall function as the Register General of Citizen Registration.

(4) The Central Government may Appoint such other officers and staff as may be required to assist the Register General of Citizen Registration in discharging his functions and responsibilities.

(5) The procedure to be followed in compulsory Registration of the Citizens of India shall be such as may be prescribed.] দেশে যদি সাংবিধানিক ব্যাবস্থা বলবৎ থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নয় এনআরসি-ও লাগু করতে পারে, কোনো রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নেই তা রুখে দেওয়ার।

> **“বিরোধীরা শুধুমাত্র বিজেপির অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্যই এই বিলের বিরোধিতা করছে। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। একদিন না একদিন তাদের উদ্বাস্তু হিন্দুদের সামনে দড়াতে হবে এবং সেদিন জবাবও দিতে হবে।”**

গত ২ ডিসেম্বর লোকসভা, ১১ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় পাশ হয়ে ১২ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল (CAB) সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টে (CAA) পরিণত হয়েছে। এই আইনে আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি এবং খ্রিস্টানদের এবার থেকে সরাসরি ভারতের নাগরিকত্ব প্রদানের কথা বলা হয়েছে। ভারতের নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য বিদেশি নাগরিকদের কমপক্ষে ১১ বছর ভারতে থাকতে হয়। এই বিল অনুসারে আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ থেকে আগত হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসি এবং খ্রিস্টানদের জন্য এই সময়কাল কমিয়ে ৬ বছর করা হয়েছে। সংসদে আইন প্রণয়নের সময় যারা এই আইনের পক্ষে ছিলেন না এখন তাদের সামনে একটিই পথ খোলা তা হলো সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হওয়া। কিন্তু বিরোধীরা সেই পথে না হেঁটে এই বিল বিরোধিতায় মেঠো রাজনীতি করতে নেমেছেন। বিরোধীরা দেশজুড়ে নানারকম গুজব ছড়াচ্ছেন। কোথাও বলা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী সরকার মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে। আবার কোথাও বলছেন নরেন্দ্র মোদী সরকার মুসলমানদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করবে। মমতা ব্যানার্জি তো এনআরসির বিরোধিতায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের নজরদারিতে গণভোটের দাবিও জানিয়ে ফেলেছেন। ফলে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে তাণ্ডব। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গে। মমতা ব্যানার্জির প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় এখানে বাস, ট্রেন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেলস্টেশন তছনছ করে কোটি কোটি টাকার রেলের সম্পত্তি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু অধুষ্যিত এলাকাগুলিতে লুঙ্গি টুপি পরা হাজার হাজার মানুষ তাণ্ডবে মেতেছে। গোয়েন্দা রিপোর্ট বলছে তাণ্ডবকারীদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীরাও বেশ ভালো সংখ্যায় রয়েছে। দিল্লি, লখনউ, আমেদাবাদ, জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভের নামে তাণ্ডব চালানো হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে পুলিশ কর্মীরাও। আন্তর্জাতিক মিডিয়ার ভূমিকা ও দেশের বাইরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগঠিত ছাত্র বিক্ষোভ থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে জেহাদি-মাওবাদী খ্রিস্টান মিশনারি ও ভারতবিরোধী শক্তির স্লিপার সেলগুলি সক্রিয় হয়ে উঠেছে ছাত্র নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য। এবং এদের প্রত্যক্ষ ভাবে মদত যোগাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেসের মতো দলগুলি।

বিজেপি বিরোধিতা করতে গিয়ে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলিকে কখনো ভারতের শত্রু পাকিস্তান আবার কখনো জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের টুকরো টুকরো গ্যাঙের পাশে দাঁড়াতেও দেখা গেছে। এবার তো বিজেপি বিরোধিতার নামে নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করতে গিয়ে এই দলগুলিকে সরাসরি মানবতা বিরোধী অবস্থান নিতে হচ্ছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব প্রদান করে দেশভাগের সময় বিশ্বের বৃহত্তম এবং জঘন্যতম গণহত্যার শিকার ছিন্নমূল হিন্দুদের ক্ষতে সামান্যতম প্রলেপ দিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার যখন বিগত সাত দশক ধরে চলে আসা মানবিকতার প্রতি এক ঘোরতর অন্যায় অবিচারের অবসান করতে উদ্যোগী হয়েছে সে সময় সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে তুচ্ছ বিরোধী রাজনীতির নামে রুখে দাড়াচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, কংগ্রেস, সিপিএমের মতো দল। মানবিক চেতনা সম্পন্ন ভারতীয় ভোটাররা ভোটের বাক্সে এই দলগুলিকে যোগ্য জবাব দেবে কিনা তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে ক্যাব নিয়ে বিরোধীদের অবস্থান ইতিহাসের পাতায় মানবতা বিরোধী জঘন্য পদক্ষেপ হিসেবে যে চিহ্নিত হয়ে থাকবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এমন বহু দৃষ্টান্ত যা থেকে প্রমাণ করা যাবে ক্যাব নিয়ে বিরোধীদের অবস্থান উদ্বাস্তু হিন্দুদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে তারই কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

রাজ্যসভার নথি বলছে, ২০০৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে ড. মনমোহন সিংহ বলেছিলেন, দেশভাগের পর বাংলাদেশের মতো দেশগুলিতে সে দেশের সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, পরিস্থিতি যদি এই হতভাগ্য মানুষগুলিকে আশ্রয় চাইতে বাধ্য করে তাহলে নিয়ম কানুন শিথিল করে এদের নাগরিকত্ব প্রদান করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য।'

১৬ জুলাই ১৯৪৭, দিল্লিতে আয়োজিত প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী যা বলেছিলেন তার সারমর্ম হলো, পাকিস্তানে যদি কেউ থাকতে না পারে আমরা তাদের ভ্রাতৃভাবে এমনভাবে আলিঙ্গন করে নেব এবং প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ সুবিধে দেব যাতে তারা অনুভব করতে না পারে যে তারা কোনো বিদেশ ভুমিতে আছে।

১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট মধ্যরাত্রে সংবিধান সভার প্রথম ভাষণে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলছিলেন, 'We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and we shall be sharers in their good and ill fortune alike....' অর্থাৎ 'রাজনৈতিক সীমানা দ্বারা যে ভাই-বোনরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং যারা দুঃখজনকভাবে অর্জিত স্বাধীনতায় অংশ নিতে পারছে না আমাদের তাদের কথাও ভাবতে হবে। তারা আমাদেরই এবং যা কিছু ঘটুক না কেন তারা আমাদেরই থেকে যাবে এবং আমরা তাদের সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের সমান অংশীদার হব।'

১৯৫১ সালের ৩০ মার্চ সংসদে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা চলছিল। উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সংসদের সাব কমিটির সদস্য হিসেবে সুচেতা কৃপালানী দেশের পূর্ব সীমান্তে বিভিন্ন উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শন করে প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারেন যে উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে উদ্বাস্তুরা বাধ্য হচ্ছে পাকিস্তানে ফিরে যেতে। তিনি বলেন, 'সরকার শতমুখে তথ্য পরিসংখ্যান দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে উদ্বাস্তুরা পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু আমি জানি তারা কেন ফিরে যাচ্ছে। তারা ভালোবেসে পাকিস্তানি নাগরিকত্ব গ্রহণের জন্য ফিরে যাচ্ছে এমন নয়। উদ্বাস্তু শিবিরগুলির ভয়াবহ পরিস্থিতিজনিত হতাশা থেকে মুসলমান হয়েই তারা সেখানে বসবাস করবে এটা নিশ্চয় করেই তারা পাকিস্তানে ফিরে যাচ্ছে।' সুচেতা কৃপালানী সে দিনের আবেগ ভরা ভাষণে বলেন, এই উদ্বাস্তুদের কখনই বিদেশি হিসেবে দেখা উচিত নয়। এদের এখানের নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করে স্থানীয় জনসাধারণ ও অর্থনীতির সাথে একাত্ম করার কথা ভাবতে হবে (Parliamentary Debates Volume IX)। শুধু কংগ্রেস নয়, এক সময় সিপিএমও উদ্বাস্তু হিন্দুদের নাগরিকত্বের দাবি জানিয়েছিল। প্রকাশ কারাতও ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে অর্থনৈতিক কারণে যারা ভারতে এসেছেন তাদের থেকে উদ্বাস্তুরা যে পৃথক তা চিঠিতে উল্লেখ করেছেন।

CPI(M) writes to PM on Citizenship Act

NEW DELHI :, MAY 25,2012 00:34 IST

The Communist Party of India (Marxist) has asked the government to amend the Citizenship Act, to provide Indian citizenship to a large number of refugees from Bangladesh, both before and after its formation. It is said there had been a consensus in Parliament when the National Democratic Alliance was in power at the Centre.

In a letter to Prime Minister Manmohan Singh, CPI(M) General Secretary, Prakash Karat, has drawn attention towards ''the citizenship problems of the large number of refugees from erstwhile East Bengal, and then even after the formation of Bangladesh, who had to free their country in particular historic circumstances on which they had no control.''

He said their situation was **"different from those who have come to India due to economic reasons".**

উপরের চিঠি থেকে পরিষ্কার যে এখন বিরোধীরা শুধুমাত্র বিজেপির অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্যই এই বিলের বিরোধিতা করছে। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না। একদিন না একদিন তাদের উদ্বাস্তু হিন্দুদের সামনে দড়াতে হবে এবং সেদিন জবাবও দিতে হবে। ▮

মিথ্যা নয়, সত্য প্রকাশিত হোক

গত ২ ডিসেম্বর প্রকাশিত স্বস্তিকার অতিথি কলমে ভারতের 'ধর্মনিরপেক্ষকতা ও হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক' বিষয়ে প্রতিবেদনটির প্রেক্ষিতে দু' একটি কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গরা শোষিত ও নিপীড়িত হচ্ছে এবং এখনও সেখানে বর্ণবৈষম্যবাদের এক চোরা স্রোত যেন বয়ে চলেছে। এ ব্যাপারটা প্রমাণ করার জন্য একশ্রেণীর সাংবাদিক ও উদারপন্থীরা সতত সজাগ ও সোচ্চার। ঠিক অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও প্রকরণের অন্ধ অনুসরণকারী কিছু সাংবাদিক ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, ভারতের প্রেক্ষাপটে যে কোনো কারণে মুসলমান সংখ্যালঘুদের ওপর হিন্দুদের প্রভুত্ব— এই তত্ত্বকে প্রতিস্থাপন করতে বদ্ধপরিকর।

আমেরিকার বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছুদিন অবস্থান করার সুবাদে সেখানকার সমাজকে আমি যেমন দেখেছি— সে ব্যাপারে কয়েকটি কথা বলতে চাই। উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের বিভিন্ন শহরে থেকে ও ঘুরে কখনো আমার মনে হয়নি— যে কৃষ্ণাঙ্গরা এখনও শোষিত ও নিপীড়িত হয়ে চলেছে বা অন্যায় ভাবে বৈষম্যবাদের শিকার। শুধু কালোরা কেন, কোনো দেশ বা প্রজাতির মানুষকেই ওদেশে মাথা ঝুঁকিয়ে চলতে হয় না— সেই অর্থে সত্যিই আমেরিকা এক free country। ওখানে বর্ণবৈষম্য এক সময় ছিল এবং ভয়াবহ ভাবেই ছিল Martin Luther King এর শহিদ হওয়া এবং ৬০-এর দশকে Civil Right Act পাশ হওয়া— এসবই তার সাক্ষ্য দেয়। আজকের আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গ নিপীড়নের myth—জাগিয়ে রাখা হয়েছে। এত বিশাল দেশে দু' একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা যে ঘটে না তেমন নয়, কোথাও কোনো কৃষ্ণাঙ্গের ওপর বাড়াবাড়ি হয়ে থাকতে পারে। হৈ হৈ, গেল গেল এক আর্তনাদ উঠতে থাকে। কিন্তু যদি দেখা যায় দেশের সিংহভাগ ক্রাইম হয়ে আসছে ওই কালোদের দ্বারা। সমস্ত কালো অধ্যুষিত অঞ্চল dowtown-গুলো চরম অপরাধপ্রবণ, যে কেউ সে কালো হোক বা সাদা হোক, রাতে ওইসব অঞ্চলে যেতে দু'বার ভাববে। Oakland downtown-এ আমি থেকেছি এবং যাকেই বলেছি সবাই চোখ কপালে তুলে আমার দিকে তাকিয়েছে। এবং সঙ্গত কারণেই ওইসব এলাকা সাধারণ মানুষের জন্য নিরাপদ নয়। কিন্তু পথে ঘাটে ট্রেনে বাসে অফিসে আমি কখনো চামড়ার রঙের জন্য কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ আচরণ হতে দেখিনি। কিন্তু তবুও সামান্যতম ঘটনাকে বাড়িয়ে এরকম প্রচার বারে বারেই শিরোনামে আসবার চেষ্টা করে।

কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় হলো ঠিক এই মানসিকতা ও একদেশদর্শিতা ভারতবর্ষের এক শ্রেণীর সাংবাদিক ও তথাকথিত উদারপন্থীদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। অত্যন্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে তারা দেশের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। সংখ্যালঘুদের ওপর কোনো বিক্ষিপ্ত ঘটনাকে ইস্যু তৈরি করে সমগ্র দেশে এক হিন্দু আগ্রাসন চলছে— এরকম তত্ত্বকে নিরন্তর খাড়া করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই অপপ্রচার ও অনুকরণকারী সাংবাদিকতার প্রতি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে সচেতন করা ও সত্যের দিকে দৃষ্টি প্রসারণ করা এই প্রতিবেদনটি অত্যন্ত সুচিন্তিত ও প্রাসঙ্গিক। অনুকরণ না করে ভারতবর্ষকে তার নিজস্ব ইতিহাসের মধ্যে খুঁজে দেখে— এই সনাতন সভ্যতার বুকে কেন এই বিষম বিচ্ছেদের রেখা--- তার সত্য অনুসন্ধানই এক সুসংবাদিকের কর্তব্য। শ্রীভগতের এই প্রতিবেদনটি বর্তমান ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলমান সম্পর্কটিকে সেই সত্য ও ইতিহাসের ভিত্তিতে দেখারই আহ্বান। প্রতিবেদনটির সুঠাম অনুবাদের মাধ্যমে সাধারণ বাঙ্গালির কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য স্বস্তিকাকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই।

—দীপায়ন সান্যাল,
চ্যাটার্জি হাট, হাওড়া।

ভুল তথ্য

স্বস্তিকার ৯ ডিসেম্বর ২০১৯-এ প্রকাশিত 'মহারাষ্ট্রে ভূলুণ্ঠিত ন্যায়, জয়ী

রাজনীতি' শীর্ষক আলোচনার লেখক একটি প্রসঙ্গ টেনেছেন— রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় দুর্যোধন বলেছেন, 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।' এটি সম্পূর্ণ ভুল তথ্য, আসলে 'মারি অরি পারি যে কৌশলে' অংশটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের অংশ। স্বস্তিকার মতো একটি দায়িত্বশীল এবং বিশ্বস্ত পত্রিকায়, যার পাঠক সমাজ অত্যন্ত ঋদ্ধ সেখানে এই প্রকার ভুল তথ্য যাতে ভবিষ্যতে পরিবেশিত না হয় সেদিকে সম্পাদক মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—তপন কুমার বৈদ্য,
দমদম।

এনআরসি প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব কেন!

'প্রতিবাদের নামে তাণ্ডব' শীর্ষক প্রতিবেদন কিছু পত্রিকায় পড়লাম। এনআরসি ও ক্যাব দুটি বিল লোকসভা ও বিধানসভায় পাশ হবার পর গত দুদিন ধরে বাংলাভাষী দুটি রাজ্যে এবং অসমে যে তাণ্ডব চালালো দুষ্কৃতীরা, তা অনভিপ্রেত। বাস ভাঙচুর, ট্রেন জ্বালানো, নাগরিকত্বের কপি পুরোনো প্রভৃতি নারকীয়কাণ্ড যারা করল তাদের ছবিটি দেখুন তাঁরা কে, কী তাদের পরিচয় আর কেন তারা এসব করল। এর থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হলো অমিত শাহের ভাষায় 'ঘুসপেটি' অর্থাৎ 'অনুপ্রবেশকারী' ঘুসনে নেহি দেঙ্গে এই হুংকার। অমিত শাহ কখনো বলেননি হিন্দু বাঙ্গালি বা মুসলমান বাঙ্গালিদের তাড়াবেন। তিনি বলেছেন, অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়াবেন। বাংলাদেশ পাকিস্তান ও আফগানিস্তান এই তিন দেশের হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পার্সি খ্রিস্টানদের শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় দেবেন। সকলেই কিন্তু অমিত শাহজীর প্রস্তাবে সহমত। উল্লেখ্য, আজ দেশ জুড়ে

এনআরসি আতঙ্কে যারা ভীত তাঁরা যে অন্যায়ভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে নয়, সেটা বুঝেই এসব করেছে। এই এনআরসি বা নাগরিকপঞ্জী সংশোধনী বিলকে সার্থক রূপ দেওয়া মোদী সরকারের কাছে চ্যালেঞ্জ আগামী ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে। কংগ্রেস কিন্তু ভোটব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়েই এই ফাইলকে চেপে যায়। প্রসঙ্গত, এনআরসি আর ক্যাবের কোনো প্রয়োজনই হতো না যদি কিনা—

১. ধর্মের ভিত্তিতে যদি দেশভাগ না হতো এবং অনুপ্রবেশের মতো জঘন্য ঘটনা না হতো। ২. প্রতিবেশী তিনটি দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা যদি নির্যাতিত ও অত্যাচারিত না হতো। ৩. এদেশে সংখ্যালঘুদের মধ্যে যদি জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ থাকত। ৪.এদেশে সংখ্যালঘুদের মধ্যে বহুবিবাহের প্রথা যদি না থাকত। ৫. এদেশে চুরি ডাকাতি খুন ধর্ষণের মতো ঘটনার বাড়বাড়ন্ত যদি না হতো। ৭. এদেশে নারীদের নিরাপদে চলার ক্ষেত্রে যদি কোনো বিপদ না হতো। ৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধিতেও উন্নয়ন সবদিক থেকে পিছিয়ে না থাকত। ৯. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণই হলো অশিক্ষিতদের মধ্যে জন্মের নিয়ন্ত্রণ নেই। ১০. নারী পাচার, পশু হত্যা, গাছগাছালি কেটে সাফ এই দুঃসাহসিক কাজে জড়িতদের বেশিটাই অনুপ্রবেশী কার্যকলাপ। ১১. কাশ্মীরকে ক্রমাগত অস্থির করে তোলার মদতদাতাদের বেশিরভাগই হলো অনুপ্রবেশকারী মুসলমান। ১২. এই অনুপ্রবেশকারীরাই গোরুচুরি করে ঃপাচার করছে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে। সেনা জওয়ানরা বাধা দিলে তাঁদের গুলি করে। ১৩. অনুপ্রবেশকারী বা শরণার্থীরা ভারতে এসে খাসজমি দখল করে ঘরবাড়ি তৈরি করে নিচ্ছে স্থানীয় নেতাদের মদতে, আবার এরা দু'দেশেই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে কি? ১৪. প্রতিবেশী তিনটি দেশে যদি হিন্দু সংখ্যালঘুদের মন্ত্রী, বিধায়ক, বিচারপতি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইত্যাদি নানান উচ্চপদে নিয়োগ হতো যেমন ভারতবর্ষ প্রকৃত উদাহরণ।

অতএব, আগুন জ্বালিয়ে ভাঙচুর করে কেন্দ্রীয় সরকারের সঠিক নীতিকে দমানো যাবে না। অবিজেপি দলগুলির প্রচ্ছন্ন মদতেই কত কত সরকারি বহুমূল্য কাগজপত্র নষ্ট হলো এর দায়ভার কে নেবে?

—রাজু সরখেল,
দিনহাটা, কোচবিহার।

ঈশ্বরবিশ্বাসী হিন্দুদের অগাধ মুসলমান প্রীতি

হিন্দুরা অধিকাংশই কল্পনাপ্রবণ। কাল্পনিক বিষয়ে তাদের অগাধ বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, শিবজ্ঞানে জীবসেবা করো, মন মুখ এক করো, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করো, এগুলো আমাদের পছন্দ হলো না। তিনি মা কালীকে দেখেছিলেন তাঁকে সন্দেশ খাইয়েছিলেন, রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধার সময় মা কালী স্বয়ং দড়ি পরিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল এসব কিছু আমরা বিশ্বাস করি পছন্দ করি গল্পও করি। আমাদের একবারও মনে হয় না এগুলো মিথ্যে কল্পনা। আমরা হিন্দুরা এগুলোকেই মূলধন করে সাধন ভজন হরিসংকীর্তন আর পূজাআর্চা নিয়ে মেতে উঠলাম। এইতো কয়েকবছর আগে ২০১০ সালে উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গায় দুষ্কৃতীরা একটি কালীমন্দির ভেঙে ভেতরে ঢুকে কালীমূর্তিটি ভেঙে তাতে প্রস্রাব করে দিয়েছিল। মা কালীর কোনও ক্ষমতা ছিল না দুষ্কৃতীদের কোনো সাজা দিতে। সেই দুষ্কৃতীরা এখনো পরমানন্দে দুষ্কর্ম করে বেড়াচ্ছে। আমাদের কোনও বিকার নেই। তারা মহাসমারোহে কালীপূজা করছে, হরি সংকীর্তন করছে আর যাগযজ্ঞ নিয়ে মেতে রয়েছে। দেশে প্রতিনিয়ত যা সব ঘটে চলেছে সেসব নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। এদের মধ্যে অনেকে আবার কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মিছিলে, মিটিংয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেছিল ''বাংলা ভাগ করল কে? শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?'' শুধুমাত্র এই নয়, গান শুরু করল ''একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান''...এরা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে যে এদের অনেকের পূর্বপুরুষরাই একদিন পূর্ব পাকিস্তানে নিজেদের পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে নিজেদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের নৃশংসভাবে নিহত হতে দেখে, নিজেদের স্ত্রী, কন্যা ভগিনীদের অপহৃতা হতে দেখে আর পরে তাদের কোনোভাবেই উদ্ধার করতে না পেরে রাতের অন্ধকারে কপর্দকশূন্য অবস্থায় একবস্ত্রে পালিয়ে আসতে হয়েছিল সেসব সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেন। বর্তমানে এই বঙ্গসন্তানগণ বাংলাদেশের শিল্পীদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। একটি টিভির বাংলা চ্যানেলে বাঙ্গলার এক মহীয়সী নারীর স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য পশ্চিমবঙ্গে কাউকে পাওয়া গেল না, বাংলাদেশ থেকে এক অভিনেতাকে ভাড়া করে আনা হয়েছিল। এ রকম আরও অনেক আছে। আর একটি ধারাবাহিকে এক মুসলমান নারী চরিত্রকে সৎ, মহান নারী চরিত্র হিসেবে দেখানো হচ্ছে আর হিন্দুদের খল, কপট, মিথ্যাচারী হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চলছে আর নির্বোধ হিন্দুরা মহানন্দে সেগুলি উপভোগ করছে। এখন দেখা যাচ্ছে শুধুমাত্র হিন্দি সিনেমা নয়, বাংলা ধারাবাহিকগুলিতেও থাবা বসিয়েছে পেট্রোডলার। এসব নিয়ে হিন্দুদের কোনও বিকার নেই। দেশটা যে ক্রমশ ইসলামিক হতে চলেছে তা নিয়ে হিন্দুদের কোনও মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। কয়েকটি বামপন্থী সংগঠন তো খোলাখুলিভাবে মুসলমানদের সমর্থনে ময়দানে নেমে পড়েছে। তথাকথিত সংখ্যালঘুদের সমর্থনে যদি আবার ক্ষমতার অলিন্দে ফিরে আসা যায়। কিন্তু সে গুড়েও তো বালি। অল ইন্ডিয়া ইত্তেহাদুল মুসলমানের আসাউদ্দিন ওয়েসিও আসরে নেমে পড়েছে নিজেদের ঘাঁটি শক্তপোক্ত করতে। এখনই যদি এই বিষবৃক্ষের চারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে উপড়ে ফেলা না হয় তাহলে সেটা একদিন মহীরুহে পরিণত হবে। তখন হয়তো আবার শুরু হবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা ডাইরেক্ট অ্যাকশন ১৯৪৬ সালের মতো। আশ্চর্যান্বিত হতে হয় পশ্চিমবঙ্গের তথাকথিত বিদ্বজ্জনদের মতিগতি দেখে। সব কিছু দেখে শুনে বুঝেও হয়তো সামান্য কিছু প্রাপ্তির আশায় এঁরা বোবাকালা বনে গেছেন। ধারণা করা অসঙ্গত নয় এদের অনেকেরই পূর্ব পাকিস্তানে/বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের অত্যাচারের কাহিনি এখনও বিস্মৃত হননি। তা সত্ত্বেও এদের অপরিসীম মুসলমান প্রীতি দুর্বোধ্য।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডেজিরে কমপ্লেক্স, বড়বাজার,
চন্দননগর।

সন্তানকে মূল্যবোধের শিক্ষা মা-বাবাকেই দিতে হবে

প্রত্যুষা দাশ

মূল্যবোধ আমাদের রোজকার জীবনের একটি কথা। কয়েক বছর আগেও এই শব্দটা আমাদের পরিবার পরিজন এমনকী পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই একটি জিনিস না থাকলে মনে করা হতো একজন মানুষ অসম্পূর্ণ। যাদের মধ্যে নেই বা কিঞ্চিৎ কম তাদের সঙ্গে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষরা দূরত্ব রেখে চলত। তখন মনে করা হতো অর্থ, বিলাসব্যসন, শারীরিক ক্ষমতা কিছুটা কম থাকলে চলতে পারে কিন্তু জীবনে মূল্যবোধ না থাকাটাকে কিছুতেই মেনে নেওয়া হতো না।

এই মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষরাই প্রকৃত অর্থে ধনী। যারা এর থেকে বঞ্চিত, তাদের জীবনে সব থেকেও এক অপার শূন্যতা ঘিরে থাকে। হয়তো তারা প্রতিদিনের চলাফেরায় এর অভাব অনুভব করতে পারত না। তবে নিভৃতে তারাও জানে যে কোনো এক চরম প্রাপ্তি থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের মানুষ বাঁকা নজরে দেখে থাকে। আর যাদের জীবনে চলার পথে মূল্যবোধ থাকে, তাদের শিরদাঁড়া সোজা রেখে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে কোনো সমস্যা হয় না। আজ বিভিন্ন আলোচনা সভায় বা পথেঘাটে শোনা যায় মূল্যবোধের নাকি বড়োই অভাব। মূল্যবোধহীন মানুষরাই নাকি আজ সর্বক্ষেত্রে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। একটা সময় ছিল এদের কিন্তু সমাজে বাঁকা চোখেই দেখা হতো।

সময় বদলেছে। দশকের পর দশক পেরিয়ে দু'হাজার উনিশের শেষে আমরা দাঁড়িয়েছি। পুরনো মানুষরা আজ সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছেন না অনেক সময়েই। মূল্যবোধের যে ধারণা নিয়ে তাঁরা বড়ো হয়েছেন তার সঙ্গে আজকের সময়ের আকাশ-পাতাল তফাত। আজ বাসে-ট্রেনে-ট্রামে যদি কেউ তার থেকে বয়সে বড়ো কাউকে জায়গাটি ছেড়ে দেয়, তাহলে সহযাত্রীরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে। কেউ কেউ অবশ্য প্রশংসা করেন। অথচ কয়েক দশক আগেও এরকম আচরণ তরুণ-তরুণীদের মধ্যে খুবই স্বাভাবিক ছিল। এখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, এদের মা-বাবারা কি এই সাধারণ মূল্যবোধটুকুও তাদের ছেলে-মেয়েদের শেখাননি?

বদলে গেছে অভিভাবকদের মানসিকতাও। একটি শিশু তার প্রথম পাঠটি পায় অভিভাবকদের কাছ থেকে। স্বাভাবিক ভাবে ধরে নেওয়া যায় তারা মা-বাবা। আগে ছোটোদের মা-বাবারা শেখাতেন বন্ধু বা ভাই-বোনেদের সঙ্গে সব কিছু ভাগ করে নিতে, মিথ্যে না বলতে, গুরুজনদের সম্মান করতে, নিজের কাজ নিজে করতে শিখতে— এই ছোটো ছোটো ভাবনাগুলি মিশেই তৈরি হতো একজন পূর্ণ মানুষ, তার সার্বিক মূল্যবোধের ভাবনা। আজ বদলে গেছে সবকিছুই। এগুলি যেন বিজ্ঞাপনে শিখিয়ে দেওয়ার বস্তু। কাপড়ে দাগ লাগলেও ঠাম্মার টাকার নোট খুঁজে দেওয়া, খেলায় জিতে যাওয়ার মুহূর্তেও প্রতিপক্ষ বন্ধুর হাত ধরে টেনে তোলা— ইত্যাদি এখন তাদের মা-বাবা নয়, বিজ্ঞাপন শেখায়। এ এক অদ্ভুত একমাত্রিক সমাজ যাপন।

মূল্যবোধ আজকের দিনে কমে যাচ্ছে কি না তা নিয়ে এক দীর্ঘ আলোচনা চলতেই পারে। নিশ্চয় আজকের প্রজন্ম সর্বতোভাবে এই মতের সঙ্গে একমত হবেন না। আবার পুরোপুরি বাতিলও করতে পারবেন না। অথচ দৈনন্দিন জীবনে এর যে বিশেষ অনুপস্থিতি রয়েছে তা অস্বীকারের উপায় নেই। ধরে নেওয়া যাক, বিয়েতে পণ দেওয়া ও নেওয়া দুটোই অপরাধ, তবু আজ এই প্রবল আধুনিক সময়েও তা প্রবল ভাবেই বিদ্যমান। শিক্ষিত বা উচ্চশিক্ষিত ছেলে-মেয়েরাও এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি। নিজেরা পছন্দ করে করে বিয়ে করলেও মেয়েটিই তার বাবার কাছ থেকে তার স্বামী বা হবু স্বামীকে পণ নিতে উৎসাহিত করতে দেখা গেছে।

আজকাল অবশ্য সব বিচারই হয় চাওয়া পাওয়ার নিরিখে। অর্থাৎ হিসেবের খাতাটি ঠিকঠাক ভরছে কিনা তার ওপরে। তাই মূল্যবোধ জিইয়ে রেখে লাভ-ক্ষতির হিসাব করতে বসেন অনেকেই। মূল্যবোধ ধরে রেখে জীবনটা সচ্ছল থাকছে কিনা তা মিলিয়ে দেখে নেন অনেকে। মূল্যবোধ সম্পন্ন পুরনো দিনের মানুষ বা আজকের মানুষদের ব্যাকডেটেড বলে মনে করেন অনেকেই। বরং তার চেয়ে মূল্যবোধকে বাক্সবন্দি করে রেখে নিজেদের জীবনে যদি বিলাসব্যসনের আয়োজন সহজ হয়, তাহলে ক্ষতি কী। এই মত অনেকেরই।

মূল্যবোধ জিনিসটি আসলে এক মহান সম্পদ। প্রতিদিনের বেঁচে থাকার রোজনামচায় রাজনীতি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকলেও প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের যে নিজস্ব সত্তা থাকে তার সঙ্গে এর গভীর যোগ রয়েছে। কোনো রাজনৈতিক দলের ভাবাদর্শ নয়, জীবনের যে শ্রেষ্ঠ নীতি যা আমাদের চালিত করে, মূল্যবোধ তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মূল্যবোধের অভাবে মানুষ অমানুষ হয়ে যায়। আমরা মা-বাবারা যদি তাদের সন্তানের মধ্যে অন্যকে সম্মান আর ভালোবাসার এবং সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃপ্তভাবে দাঁড়োনোর মূল্যবোধটুকু জারিত করতে না পারি, তবে সময়ের সঙ্গে ন্যায় করা হবে না। সন্তানের সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনিও সমাজে শিরদাঁড়া সোজা রেখে মাথা উঁচু করে চলতে পারব না। ■

শরীরচর্চা কতক্ষণ ও কীভাবে করা উচিত

ডাঃ পার্থসারথি মল্লিক

আমরা জন্মের পর থেকে হাত-পা নড়াচাড়া করি কিন্তু দিন দিন আর আমরা সেই স্বাভাবিকতা ধরে রাখতে পারছি না। শহরের মানুষ দিনে ৮-১২ ঘণ্টা অফিসে কাটায়। এদের বেশিরভাগেরই কাজ বসে বসে। অফিসে বসে থাকা, যাত্রা পথে বসে থাকা, বাড়িতে এসে স্মার্ট গ্যাজেটে বা টিভির সামনে বসে থাকা। ফলে বাড়ছে নানা রকম অসংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব। কারোও লিপিড প্রোফাইলের অবস্থা তথৈবচ আবার কারো রক্তে চিনি বা সুগার মাত্রাছাড়া। আবার কেউ ভুগছেন উচ্চ রক্তচাপ, নানা রকম শারীরিক ব্যথা, অসময়ে মুটিয়ে যাওয়া।

রেহাই পাওয়ার কি উপায় আছে?

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। শরীরচর্চা এমনই এক মরীচিকা। কাল থেকে শুরু করব, পরশু থেকে করব, আগামী সপ্তাহে করবই, এমন অজুহাতেই চলতে থাকে; শরীরচর্চা আর শুরু হয় না।

শরীরচর্চার গুরুত্বকে অস্বীকার করা মানে রোগবালাইকে আমন্ত্রণ জানানো। বাচ্চারা শরীরচর্চা না করলে মুটিয়ে যাবে, শারীরিক গঠন ঠিক হবে না, মাঝ বয়সিরা ব্যায়াম না করলে ডায়াবেটিস, রক্তচাপ চেপে ধরবে আর বৃদ্ধবয়সে ভালো থাকার একমাত্র উপায় হলো শরীরচর্চা বা ব্যায়াম।

কখন শরীরচর্চা করবেন?

সারাদিন ব্যস্ত থাকি ব্যায়াম করার সময় নেই। শরীরচর্চা করতে আপনাকে জিমে বা পার্কে যেতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আপনি যে কোনো সময় যেকোনো জায়গায় ব্যায়াম করতে পারেন। হাঁটা হলো সবচেয়ে সহজ ও উপকারী শরীরচর্চা। সকালে বা সন্ধ্যায় পার্কে গিয়ে বা ওয়াকওয়েতে হাঁটা সবচেয়ে ভালো। আপনি যদি বাড়ির ২ কিলোমিটার আগেই বাস থেকে নেমে পড়েন এবং এই রাস্তাটুকু হেঁটে যান তবে আপনার হাঁটার সময় বের হয়ে যাবে। অনেক যুবক, ছেলে-মেয়ে কলকাতার রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছেন। এদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল, পড়ুয়া, অনেকে চাকরিজীবী। বড়ো বড়ো পদের অনেক কর্মকর্তাকে দেখা যায় যিনি কিনা সাইকেল চালিয়ে অফিসে যান।

শরীরচর্চা যখন ক্ষতির কারণ :

সব কিছুরই ভালো ও মন্দ দিক থাকবে। শরীরচর্চাও এর ব্যতিক্রম নয়। শরীরচর্চা করতে গিয়ে হামেশাই অনেকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। দেখা যায় জিম বা ব্যায়ামগারে গিয়ে ভারি ব্যায়াম করতে গিয়ে এরা শরীরের ঘাড়, কোমর, পা ও হাঁটুতে আঘাত প্রাপ্ত হয়েছেন। অনেক ব্যায়ামগারেই প্রশিক্ষিত ট্রেনার নেই। শরীরের ধরন অনুযায়ী ব্যায়াম না করলে উল্টো ফলই হবে। অনেকের ধারণা জিমে গিয়ে খুব করে কয়েকদিন ব্যায়াম করলেই শরীর ফিট হয়ে যাবে। এটি ভ্রান্ত ধারণা। যারা অভিনয়, মডেলিং বা শরীর গঠন প্রতিযোগিতায় যেতে যান কেবল তাদেরই জন্য ব্যায়ামাগার বা জিম এক্সারসাইজ মানানসই। অনেকে শরীর গঠনের জন্য নানা ধরনের অনুমোদনহীন খাদ্য বা স্টেরয়েড গ্রহণ করেন যা একেবারেই ভুল। এতে শরীরে মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে।

ব্যথার রোগীরা কী ব্যায়াম করবেন?

ব্যথার রোগীদের অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক ব্যায়াম করতে হবে। যাকে আমরা Therapeutic Exercise বলি। শরীরের বিশেষ অংশের জন্য ব্যায়াম আছে যা কেবল চিকিৎসকেরই ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী করতে হবে। ধরুন হাঁটুর ব্যথার রোগীরা যদি খুব বেশি হাঁটেন তবে হাঁটু ব্যথা বেড়ে যেতে পারে, এক্ষেত্রে রোগীর সাঁতার কাটতে পারেন বা স্টাটিক সাইক্লিং করতে পারেন।

কতক্ষণ ব্যায়াম করবেন?

৩০ মিনিট করে সপ্তাহে ৫ দিন ব্যায়ামই শরীর সুস্থ রাখার জন্য যথেষ্ট। তবে শরীরের গঠন ও রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও বেশি সময় ব্যায়াম করা যেতে পারে। যেমন একজন ডায়াবেটিক রোগীর সপ্তাহে ৫ দিন ১ ঘণ্টা করে হাঁটলে সুস্থ থাকেন। যারা ওজন কমাতে চান তাঁদের উচিত প্রতিদিন ৪০-৪৫ মিনিট হাঁটা। এই হাঁটা কিন্তু ঢিমেতালে হাঁটা নয়। এমন গতিতে হাঁটতে হবে যাতে শরীর ঘেমে ওঠে, গতি হবে যাতে ঘণ্টায় ৫-৬ কিলোমিটার।

হাঁটার হিসাব যেভাবে রাখবেন :

টেকনোলজি আমাদের জীবনকে যেমন স্থবির করে দিয়েছে তেমনি দিয়েছে অনেক সুবিধা। দুই থেকে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে একটি ফিটনেশ ট্রাকার বা স্মার্ট ওয়াচ কিনে নিলেই সেইসব হিসেব রাখবে। দিন শেষে দেখতে পারবেন আপনি কত স্টেপ হেঁটেছেন এবং কত ক্যালরি খরচ করেছেন।

সেরাজেন, সুস্থতা ও হাঁটাহাঁটি : শোনা যায় ডায়াবেটিক রোগী সেরাজেন মেশিনে হিট নিলেই তার ১ ঘণ্টা হাঁটার কাজ হয়ে যায়। এটা একেবারেই ভিত্তিহীন। শরীরচর্চা কেবলমাত্র হাঁটা, সাঁতার, খেলাধুলা বা ব্যায়ামাগারের ব্যায়ামের মাধ্যমেই হতে পারে, অন্যভাবে নয়। ■

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ব্যারাকপুর জেলার হালিশহর নগর কার্যবাহ বিকাশ সরকারের পিতৃদেব বৈদ্যনাথ সরকার গত ৮ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৪ পুত্র ও ২ নাতি রেখে গেছেন।

এই জল্লাদের উল্লাসমঞ্চ আমার দেশ নয়

সুজিত রায়

এ কোন সকাল? রাতের চেয়েও অন্ধকার!

এ কোন পশ্চিমবঙ্গ? এ কোন ধ্বংস, লুণ্ঠন, অরাজকতার রাজ্য?

এ রাজ্যকে আমি চিনি না।

এ পশ্চিমবঙ্গ আমাদের রাজ্য নয়।

এ পশ্চিমবঙ্গ আমার চেনা বাসভূমি নয়।

এ পশ্চিমবঙ্গ অন্য কোনও হানাদারের যারা রাতের অন্ধকারে হায়নার মতো নিঃশব্দ পদচারণা করে পেরিয়ে আসে সীমান্ত। যাদের শরীর মোড়া থাকে কালো জোব্বায় কিংবা হিজাবে কিংবা বোরখায়।

এ পশ্চিমবঙ্গ অন্য কোনো চক্রান্তকারীদের যারা জানে যে কোনো মুহূর্তে সার্জিকাল স্ট্রাইক আছড়ে পড়বে তাদের ওপর। তার আগে রাজ্যের যতটা পুড়ে যায় যাক। যতটা ধ্বংস হয় হোক। যতটা লুণ্ঠন করে কেড়ে নেওয়া যায়, যাক।

এ পশ্চিমবঙ্গ সেইসব জেহাদিদের যারা ধ্বংস করতে চায় বাঙ্গলার কৃষ্টি, বাঙ্গলার সংস্কৃতি, বাঙ্গলার ঐতিহ্য, বাঙ্গলার শান্তি।

এ পশ্চিমবঙ্গ সেইসব রাজনীতিবিদদের যাদের উস্কানিতে বিদেশি হানাদাররা প্রশ্রয় পায়। পাকিস্তান বানাতে চায় বাঙ্গলার মাটিতে। জুড়তে চায় এক নয়া ইতিহাস শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসে।

না। আমি বিশ্বাস করি না, এরা বঙ্গসন্তান, বঙ্গবাসী, বঙ্গভাষী। না, আমি বিশ্বাস করি না এরা ভারতীয় এরা ভারতবাসী, এরা ভারতীয় সভ্যতার ধারাবাহিক উত্তরাধিকারী। না, আমি মানি না, ওইসব লুণ্ঠনকারীরা আমার ভাই, আমার বোন, আমার মাতৃসমা কিংবা পিতৃসম।

না, আমি ভাবতে পারি না, এতদিন যা ভেবে এসেছি— আমরা রাম হলে ওরাও রহিম।

না, আমি বুঝতে পারি না— এই বাঙ্গলার একই গাছের ছায়ায়, একই সূর্যালোকে, একই শীতল বাতাসে, একই মাতৃদুগ্ধে, একই দেশমাতৃকার কোলে আমাদের বেড়ে ওঠা একসঙ্গে। না, সত্যিই ভাবতে কষ্ট হয়— ওই বর্বর ডাকাতের দল যারা দিনে-দুপুরে ছিনিয়ে নিতে চায় একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বাধীনতা,

প্রতিবাদীদের আক্রমণে আহত এক মহিলা রেলযাত্রী।

একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অঙ্গীভূত রাজ্যের মানুষের মৌলিক অধিকার ছিনতাইবাজের মতো। তারা আমার রাজ্যের বাসিন্দা। বিশ্বাস করুন, আমার দু'চোখ জলে ভরে আসে যখন দেখি ওরা দল বেঁধে পাথর ছুঁড়ছে পাক-জঙ্গি যুবকদের মতো পুলিশকে লক্ষ্য করে, অসহায় নিরস্ত্র সাধারণ ট্রেনযাত্রী, বাসযাত্রীদের লক্ষ্য করে। যখন দেখি ওরা লাঠি তুলছে আমার বৃদ্ধা প্রতিবেশীর মাথা লক্ষ্য করে। যখন দেখি আমার সন্তানসম শিশুটির আকুল কান্নাও তাদের নিরস্ত করতে পারছে না।

আর আমার মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে, যখন দেখি ওইসব নিরীহ কৃষক, নিরীহ রাজমিস্ত্রী যাদের এতদিন ডেকেছি চাচা বলে, ভাইজান বলে, তারাই বাবর, নাদির শা, আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারের তকমা নিয়ে আমার বোনকে বেইজ্জত করে, ধর্ষণ করে, পুড়িয়ে মারে। আমার স্ত্রীর শাড়ির আঁচল ধরে টানে আর সেই সেদিনের কাশ্মীরের মতোই প্রায় চিৎকার করে বলতে চায় বিদেশি মদতপুষ্ট অনুপ্রবেশকারীরা— অপলোগ পশ্চিমবঙ্গ ছোড়কে চলা যাইয়ে, আপকা বিবিকো লেড়কিকো ইধার ছোড়কে।

আপনার মাথায় আগুন জ্বলবে না একথা শুনে? আপনি আগুন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়বেন না এরপরও? আপনি এরপরও বলতে পারবেন আমি রাম— ওরা রহিম? আপনি এরপর চোখের জল ফেলবেন আপনার হারিয়ে যাওয়া চাচা চাচি ভাইজানের স্মৃতিচারণা করে?

না। একদিন নয়। দুদিন নয়। তিনদিন নয়। টানা এক সপ্তাহ ধরে রাজ্যে আগুন জ্বলেছে। একটি নির্বাচিত সরকারের চোখের সামনে স্টেশনের পর স্টেশন জ্বলেছে। ট্রেনের পর ট্রেন পুড়েছে। ভাঙচুর চলেছে নির্বিবাদে। বিনা বাধায়। বিনা প্রতিরোধে। পুলিশ এসেছে। কতিপয়। দাঁড়িয়ে দেখেছে। মজা লুটেছে। ঝকঝকে ভলভো বাসগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর ওইসব লুটেরাদের পায়ে পায়ে ঘরে ফিরেছে পুলিশ। সরকার প্রথম দু'দিন চোখ বুঝে থেকেছে।

কেন? সরকারকেও কেউ বুঝি শাসিয়েছিল, সেই প্রবাদবাক্যটি উদ্ধৃত করে— মাস্টারমশাই

(পড়ুন দিদিমণি) আপনি কিছু দেখেননি? যিনি নিজেকে মাঝে মাঝেই হিজাবের ঘেরাটোপে ঘিরে নেন, বসে পড়েন নমাজের কায়দায়, তাঁকেও কি ওই হানাদাররা শাসিয়েছিল— মিস্টার ফ্রাঙ্কেনস্টাইন (পড়ুন দিদিমণি) আমি তো আপনারই সৃষ্টি, তাহলে আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন?

প্রাথমিক হিসেব— শুধুমাত্র দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর ডিভিশনে ক্ষতির পরিমাণ ২০ কোটি টাকা। তারপর রাজ্যের প্রায় সর্বত্র বাস পোড়ানো, দোকান পোড়ানো, ভাঙচুর, রাহাজানি— এসব মিলিয়ে ন্যূনতম চার কোটি! অর্থাৎ ২৪ কোটি শেষ। তার সঙ্গে যা অঙ্গীভূত হলো— মানুষের হয়রানি, নারীর চোখের জল, শিশুর খিদে, তৃষ্ণার্তের আর্তি, অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পিতা-মাতা, মাতামহী, পিতামহীদের অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠা বুকের হাহাকার ধ্বনি। এসবের হিসেব কি মাপা যাবে অঙ্কের হিসেবে?

কিন্তু কেন?

একটাই কারণ— দেশের নাগরিকত্ব আইন সংশোধন করা হয়েছে। কেন করা হয়েছে? অসহায় উদ্বাস্তুদের, শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দিয়ে সম্মান জানানোর জন্য। তারা নামলেন পথে? তাঁরা ভাঙচুর করলেন? তাঁরা আগুন জ্বালালেন?

না। আমরা শুনেছি— ধ্বংস যেখানে, সেখানেই নারা— 'আল্লাহু আকবর'। 'পাকিস্তান তেরা নাম হ্যায় ইনসান।' না, এ স্লোগান আমার নয়। আপনার নয়। আপনিও জানেন। হ্যাঁ আপনিও জানেন, এ স্লোগান এপারের নয়। ওপারের। যেখানে তারও পরপারের দেশ থেকে এসেছে জঈশ-ই-মহম্মদ, জামাত-ই-ইসলামির মতো আন্তর্জাতিক ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনের হাতে তৈরি আত্মঘাতী মূর্খ পাকপন্থী ইসলামির দল।

এতদিন তারা ছিল বুক ফুলিয়ে। রাজনৈতিক ধান্দাবাজির বেলুনের হাওয়ায় ফুলে ফেঁপে। এবার বুঝেছে। সন্ধিক্ষণ এগিয়ে এসেছে। এবার তাদের পিঠে ছাপ পড়বেই 'অনুপ্রবেশকারী' এবং নিশ্চিন্তে ভারতবর্ষকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবার মতো পরিকল্পনাকারীদের এবার বার করে দেওয়া হবেই ঘাড় ধাক্কা দিয়ে। কারণ রাজনীতির তোষণের বেলুন ফুটো হয়ে গেছে।

একটু তাকিয়ে দেখুন। জ্বলেছে অসম। জ্বলছে পশ্চিমবঙ্গ। বাকি ভারতবর্ষ? —না কোথাও আগুন দেখা যায়নি। কোথায় সন্ত্রাসের ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়নি আকাশ। না কোথাও ভাঙচুর হয়নি। লুটতরাজ হয়নি। বাস পোড়েনি। দোকান পোড়েনি।

এরপরেও কি মানতে হবে— না, গোটা ভারতবর্ষই নাগরিকত্ব আইন সংশোধনীর বিরোধী? গোটা দেশ যেমনটি বলছেন ওই হিজাব পরা মাননীয়া? এর পরেও কি শুনতে হবে, এসব আইন মানি না, মানব না যেমনটি দাবি করছেন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে? যে মুখ্যমন্ত্রী শপথ নেওয়ার সময় জনসমক্ষে বলেছিলেন, I do swear in the name solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established...? এরপরেও কি আমরা ভুলে যাব— তিনিই ২০০৫ সালে বিজেপির জোটসঙ্গী হয়ে ২২ অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গে নাগরিকপঞ্জির দাবি তুলেছিলেন? লোকসভায় প্রস্তাব পেশ করার অনুমতি না পেয়ে লোকসভার ডেপুটি স্পিকারকে নাগরিকপঞ্জির নথি ছুঁড়ে মেরেছিলেন তিনি নিজের হাতে?

না, আমি বা আপনি কিছুই ভুলিনি। ভুলিনি এই বাঙ্গলার আত্মা রবীন্দ্রনাথের সেই সত্যি কথা— ''পৃথিবীতে দুটি ধর্মসম্প্রদায় আছে অন্য ধর্মমতের সঙ্গে যাদের বিরুদ্ধতা অত্যুগ্র— সে হচ্ছে খ্রিস্টান আর মুসলমান ধর্ম। তারা নিজেদের ধর্মকে পালন করেই সন্তুষ্ট নয়, অন্য ধর্মকে সংহার করতে উদ্যত।'' না, আমি বা আপনি— আমরা কেউই ভুলিনি ওইসব ধান্দাবাজি মানুষের প্রচার— হিন্দুটিন্দু বুঝি না, আমি মানুষ (মানবাধিকারবাদী), আমি মার্কসবাদী (নব্য সাম্যবাদী), আমি বুদ্ধিজীবী (সবচেয়ে বড়ো ধান্দাবাজ), তাদের উদ্দেশ্য করেই রবীন্দ্রনাথ নিঃশঙ্ক চিত্তে লিখে গিয়েছেন— ''হিন্দু ভারতবর্ষের একটি জাতিগত পরিণাম।'' বলেছেন— ''আমি হিন্দু একথা বলিলে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণ থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতে হইবে। কারণ বিধাতার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে হইলে সেই আপিল আদালতের জজ পাইব কোথায়?''

মনে পড়ে ১৯৪৬-এর দাঙ্গা? না, আমরা জানি না কারণ আমরা তখন মাতৃগর্ভেও আসিনি। কিন্তু ইতিহাস তো থেকে যায়। থেকে যায় আমাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতিচারণ। কলকাতা শহরের রাস্তায় সেদিন হিন্দুর মৃতদেহের স্তূপ জমেছিল আর দাঙ্গার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যিনি সেই সুরাবর্দিকে সঙ্গে নিয়ে নিশ্চিন্তে অনশনে বসেছিলেন গান্ধীজী পেশাদারি এক নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে।

আমরা ভেবেছিলাম— সেটাই হবে এ বাঙ্গলার শেষ দাঙ্গা। এমনকী, ১৯৯২-এ ডিসেম্বরের দাঙ্গায় গোটা দেশ জ্বললেও পশ্চিমবঙ্গ জ্বলেনি। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাজ্য পুলিশের অপারগতা অনুমান করে গোটা রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন সামরিক বাহিনীর হাতে।

না, মিথ্যে বলব না। ২০১৯-এর এই বারবেলায় পশ্চিমবঙ্গে দাঙ্গা হয়নি। যা হয়েছে তা একপেশে ধর্মীয় আক্রমণ (যদিও আজকের মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় তা প্রতিবাদ)। কিন্তু অস্বীকার কি করা যাবে (সম্ভবত মাননীয়াও অস্বীকার করবেন না) যে অদূর ভবিষ্যতে দাঙ্গা-পরিস্থিতির সম্ভাবনাটা উস্কে দেওয়া হলো? এবার জ্বলেনি। কারণ হিন্দুরা, বৌদ্ধরা, শিখরা, জৈনরা, বাহাইরা, মতুয়ারা, জরাথুস্টরা

প্রতিরোধের সবরকম প্ররোচনাকে এড়িয়ে গেছেন। কারণ আমরা ভুলিনি রবীন্দ্রনাথের সেই অমোঘ সত্য— ''হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নয়, হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটা জাতিগত পরিণাম। জাতি জিনিসটা মতের চেয়ে অনেক বড়ো।'' তাই সামলে গেছেন হিন্দুরা। কিন্তু যদি তাঁরা পথে নামতেন? যদি তাঁরা সিদ্ধান্ত নিতেন পথ অবরোধে আটকে পড়া অ্যাম্বুলেন্সকে পথ করে দেবেন তাঁর শেষযাত্রায়? যদি তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন স্কুলফেরত শিশুদের, দূর যাত্রা শেষে ফেরত ট্রেনযাত্রীদের পৌঁছে দেবেন যে যার গন্তব্যস্থলে? না, কেউ তা করেননি। হিন্দুরা করেননি কারণ করলে দাঙ্গা হতো। কিন্তু বাকিরা? ওই মানবাধিকারের যাঁরা বড়াই করেন— সেনবংশজাত চলচ্চিত্র নাট্যশিল্পীরা, সরকার বংশজাত, গোস্বামী বংশজাত কবিরা, তৃণমূলি জমানায় প্রসন্নচিত্ত শিল্পীরা— তারাও তো নামেননি। প্রেসক্লাবে বসে বিনি পয়সার চায়ে চুমুক দিতে দিতে বড়ো বড়ো কথা বলেছেন— মানবপ্রেমের কথা, মানবাধিকারের কথা, মনুষ্যত্বের কথা! ধিক্। আপনাদের জন্য মুখের থুতু নষ্ট করতেও দু'বার ভাবতে হয়।

না, সংখ্যালঘুরা ভয় পাবেন না। যাঁরা ভারতীয় সংখ্যালঘু তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের নাগরিকত্ব কেউ কেড়ে নেবে না, কেড়ে নিতে পারবে না। কোনও সংবিধান নয়। কোনো আইন নয়। কোনো রক্তচক্ষু নয়।

কিন্তু যেসব সংখ্যালঘু গত এক সপ্তাহ ধরে বীরত্ব দেখালেন ২০ কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস করে, ভারতের ইজ্জতকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়ে, তাদের জন্য শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, গোটা ভারতবর্ষই অনাদিকালের জন্য ধর্মশালার ভূমিকা পালন করবে না। হিন্দু সহনশীল। কিন্তু সহনশীলতারও একটা সীমা থাকে। নদীর বাঁধ যখন ভাঙে তখন যে সুনামির মতোই গ্রামের পর গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ওইসব বীরপুঙ্গবদের বলতেই হচ্ছে— আপনারা ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরে যান আপনার পড়শীর মতোই যাঁরা নিজেদের অনুপ্রবেশকারী বলে ঘোষণা করেই ভারত সীমান্ত পার হয়েছেন বাগদার কুলিয়া, রণঘাট, কাশীপুর, জিৎপুর, বাঁকাঘাটা বর্ডার পার হয়ে। বনগাঁ, বসিরহাটের বিস্তীর্ণ সীমান্ত আজও বিলকুল কাঁটাতার বিহীন। হে আল্লার বীরসন্তানেরা! নিশ্চিন্তে দেশে ফিরুন। আমরা আপনাদের মুখে জাতীয়তাবাদ আর গণতন্ত্রের কথা শুনতে চাইছি না। আমরা শ্রেণী সংগ্রাম, সর্বহারার বিপ্লবের কথাও অনেক শুনেছি। কিন্তু তাঁদেরও বিপ্লবী পতাকার আড়ালে তোষণবাদী ভোটযন্ত্রের খেলা আমরাও জেনেছি, বুঝেছি। ঠিক সার্জিকাল স্ট্রাইকের সময় আপনাদের দেশ পাকিস্তানের সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছিল বিশ্ব, ঠিক কাশ্মীরকে শাপমুক্ত করার সময় যেমনভাবে গোটা বিশ্ব দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের পাশে, ঠিক যেমনভাবে জঈশ নেতা মাসুদ আজহারকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করতে গোটা বিশ্ব একমত হয়েছিল। এবারও দেখবেন, আপনাদের পায়ের তলায় ভারতবর্ষ তো নেই-ই। গোটা বিশ্বই নেই। এমনকী নেই পাকিস্তানও। ঠিক আজ যেমন বাংলাদেশ আপনাদেরই বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে ধরে জেলবন্দি করছে, কাল তেমনই যেখানে ঢুকতে যাবেন সেখানেই রোহিঙ্গাদের মতো আপনাদের পরিচয় হবে নাগরিকত্বহীন সংখ্যালঘু। সেদিন দেখব, আজকের বীরত্ব কতখানি মজবুত থাকে!

আমরা হিন্দু। সমগ্র ভারতবসী হিন্দু। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ হয়েও হিন্দুরাষ্ট্র। কারণ হিন্দু কোনো ধর্ম নয়। হিন্দু একটি জাতি। এই হিন্দুর আত্মিক মন্ত্র—

'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু
মা কশ্চিৎ দুঃখভাগভবেৎ।'

আপনারা আগুন জ্বেলে অন্যায় করেছেন। আমরা আগুন দেব না। আপনারা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করেছেন। আপনাকে আমরা ধ্বংস করব না। শুধু হাতজোড় করে বলব— ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব আইন অনুযায়ী অনুপ্রবেশকারীরা, নিজভূমে ফিরে যান। সুখে থাকুন। শান্তিতে থাকুন। যাতে আমায় কখনও না বলতে হয়—

''এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না
এই রক্তস্নাত কসাইখানা আমার দেশ না
এই জহ্লাদের উল্লাসমঞ্চ আমার দেশ না
এই বিস্তীর্ণ শ্মশানভূমি আমার দেশ না
আমি আমার দেশকে ঘিরে কেড়ে নেব।''

রাজ্যব্যাপী হিংসার পিছনে আছে গভীর ষড়যন্ত্র

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিনে পশ্চিমবঙ্গে যে নৈরাজ্যের ঘটনা ঘটেছে, সে সম্পর্কে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে আসছে। এই প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করতে বসলেই বোঝা যাবে, নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করা একটি অছিলা মাত্র। এর পিছনে রয়েছে আরও এক গভীর ষড়যন্ত্র, যে ষড়যন্ত্র পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাতে চায়। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদের উভয় কক্ষে পাশ হবার পরপরই গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের সর্বত্র হিংসার ঘটনা ঘটতে শুরু করল। সব থেকে বড়ো হিংসার ঘটনা ঘটল মুর্শিদাবাদ জেলায়। বিভিন্ন রেলস্টেশন ভাঙচুর করে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। রেল লাইন এবং রেলের সিগনালিং ব্যবস্থার ক্ষতি করা হলো। এমনভাবে ক্ষতি করা হলো, যাতে চট করে রেল ব্যবস্থাকে আবার স্বাভাবিক করে তোলা না যায়। রেলস্টেশনের টিকিট কাউন্টার থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করা হলো। ১৭ কোটি টাকারও বেশি রেল সম্পত্তি ধ্বংস করা হলো। জাতীয় সড়ক অবরোধ করেও বিক্ষোভ চলল। বহু সরকারি, বেসরকারি বাস ও গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হলো। এমনকী অ্যাম্বুলেন্সেও আগুন লাগানো হলো। বহু জায়গায় হিন্দুদের বাড়িঘর আক্রান্ত হলো, লুটপাট হলো। এই লেখা যখন লিখছি, তখনও খবর পাচ্ছি হাসনাবাদ ও বসিরহাটের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুদের ওপর হামলা হচ্ছে। হাওড়ার সাঁকরাইলে এই তাণ্ডববাজদের ছোঁড়া বোমার আঘাতে এক আই পি এস অফিসার মারাত্মক আহত হয়েছেন। গণ্ডগোল শুরু হওয়ার পর প্রথম তিনদিন পুলিশ কার্যত নিষ্ক্রিয় থেকেছে। হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনোরকম ব্যবস্থাই নেয়নি তারা। তিনদিন পর সামান্য সক্রিয় হলেও যতটা সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন ছিল, ততটা হয়নি তারা। মুখ্যমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা বললেও এই হামলাবাজরা মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে কোনো গুরুত্বই দেয়নি। বরং, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে কার্যত উপেক্ষা করে তারা তাদের মতো সর্বত্র হামলা চালিয়ে গেছে। মুখ্যমন্ত্রীকেও সামান্য একটা বিবৃতি দেওয়া ছাড়া এই হামলাবাজদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। সংসদে বিল পাশের সাতদিন পরেও রাজ্যে অশান্তির ঘটনা যে বন্ধ হয়েছে তা নয়। বরং, ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু হিংসার খবর পাওয়া গেছে।

এখন প্রশ্ন হলো, কারা এই হিংসার ঘটনা ঘটালেন? কেন ঘটালেন? এই ঘটনা ঘটানোর পিছনে কী তাদের উদ্দেশ্য? বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে এই ঘটনাগুলি দেখা গিয়েছে। বিভিন্ন কাগজে ছবিও বেরিয়েছে। তাতেই কারা হামলা করছে, তাও পরিষ্কার দেখা গিয়েছে। ফলে, মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসকদল যতই একে স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন বলে চালাতে চান না কেন, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অন্তত বুঝতে পারছেন এটি স্বতঃস্ফূর্ত গণ-আন্দোলন নয়। এটি একটি বিশেষ ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর একটি অংশের সমাজবিরোধীদের কাজ। সমাজবিরোধী এই কারণেই বললাম যে, তা না হলে কেউ রেলওয়ের টিকিট কাউন্টার থেকে টাকা লুট করে নিয়ে চলে যেতে পারে না। বলা হচ্ছে, এরা নাকি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছে। কেননা, এরা মনে করে এই আইনের ফলে এই দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হবে। অথচ, এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ভারতীয় ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের যে সংবিধান স্বীকৃত অধিকার দেওয়া আছে, তা এই আইনে কোনো অবস্থাতেই ক্ষুণ্ণ হবে না। অর্থাৎ, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, পার্সিদের নাগরিকত্ব দিলেও তা এদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে দেওয়া হবে না। তাহলে এদের বিক্ষোভ কেন? এবার একটু ভাবলেই বুঝতে পারবেন, সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ আসলে পুরোপুরিই একটি অছিলা। এই হাঙ্গামাবাজির মূল লক্ষ্য সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বাতিল করানো নয়, বরং মূল লক্ষ্য আরও অন্য কিছু, আরও গোপনীয় এবং গভীর কিছু। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন যেভাবে, যে কায়দায় রেল যোগাযোগ বিনষ্ট করে, জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে, তাতে মুর্শিদাবাদ থেকে উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের, বিশেষত মুর্শিদাবাদ জেলার সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য অংশের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলাটা কিন্তু তাৎক্ষণিক স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ নয়। এটি একটি বড়োসড়ো পরিকল্পনার মহড়া মাত্র। স্বাধীনতার লগ্নে মুর্শিদাবাদ জেলা ৪৮ ঘণ্টার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হলেও, পরবর্তীকালে এই জেলাকে বৃহত্তর বাঙ্গলার অংশ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চক্রান্ত থামেনি। সে চক্রান্ত এখনো চলছে। মুর্শিদাবাদ জেলাতেই স্বাধীন মোগলস্তান গড়ার লক্ষ্যে লিফলেট ছড়িয়েছে ইসলামিক মৌলবাদীরা। মুর্শিদাবাদ জেলাতেই সব থেকে বেশি বেআইনি মাদ্রাসা চলছে। মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামগুলি দিনদিন হিন্দুশূন্য হয়ে পড়ছে। কাজেই নাগরিকত্ব আইনকে হাতিয়ার করে মুর্শিদাবাদ জেলাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার একটি মহড়া যদি সেরে ফেলা

জেহাদি আক্রমণের শিকার এই শিশুটিও।

প্রতিবাদীদের তাণ্ডবে তছনছ রেলের টিকিট কাউন্টার।

যায়— তাহলে তাতে কাদের সুবিধা সকলেই বুঝতে পারবেন। আর মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি সমগ্র উত্তরবঙ্গকেও যদি বিচ্ছিন্ন করে রাখা যায়, তাহলে মালদা থেকে কোচবিহার অনেকগুলি জেলাতেই আগুন জ্বালিয়ে একটি গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়া যাবে। যেরকম গৃহযুদ্ধ ১৯৪৬ সালে বাধিয়ে মহম্মদ আলি জিন্নাহ পাকিস্তান আদায় করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আরও একটু গভীরে গিয়ে ভাবলে বুঝবেন, পরিকল্পনাটি সেই একই। ১৯৪৬ সালের মতোই ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় হিন্দুদের উপর আক্রমণ, যেটি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস হিসাবেই ইতিহাসের পাতায় রয়ে গিয়েছে, তা শুরু হয়েছিল এক শুক্রবার, জুম্মার আজানের পরই। ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৯ যেদিন থেকে নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের নামে জেলায় জেলায় তাণ্ডব শুরু হলো, সেদিনটিও ছিল শুক্রবার। সেদিনও মসজিদগুলি থেকে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করে জুম্মার আজানের পর বার্তা দেওয়া হয়েছিল। সাদৃশ্য আরও রয়েছে। ১৯৪৬ সালের আগস্টে যখন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমির দাবিতে কলকাতা শহরে মুসলিম লিগ বাহিনী অবাধ লুটপাট, খুনজখম, নারী ধর্ষণ করছে, সেই সময় অবিভক্ত বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী জিন্নাহ ঘনিষ্ঠ সৈয়দ সোহরাওয়ার্দি তার পুলিশকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। এবারও কিন্তু পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখল রাজ্য সরকার। ২০১৯-এর ১৩ ডিসেম্বর থেকে সংগঠিতভাবে জেলায় জেলায় যে হাঙ্গামা হলো, তা পুরোপুরিই একটি বৃহৎ পরিকল্পনার অঙ্গ। পরিকল্পনাটি হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গকে আর একবার ভাগ কর। ১৯৪৬ সালে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংসের পর তখনকার বড়লাট মাউন্টব্যাটেন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে বলেছিলেন, 'জিন্নাহ শুধু মহড়া হিসাবে কলকাতায় ৫০০০ মানুষকে খুন করিয়েছেন। কাজেই তাকে পাকিস্তান না দিলে তিনি কী করবেন বুঝে নিন।' আজ ২০১৯ সালে জিন্নাহর মতোই কেউ মহড়া হিসেবে সর্বত্র সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়ে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত করে তুলতে চাইছে কিনা— সেটাও ভাবতে হবে।

এ তো গেল একটি দিক। এই ঘটনাবলীর আর একটি দিকও রয়েছে। সেটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিক। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবিধানগতভাবে শপথ নিয়েছেন যে, তিনি সততার সঙ্গে রাজধর্ম পালন করবেন। অর্থাৎ রাজ্যের জনগণকে প্ররোচিত করার মতো কোনো কাজ করবেন না। কোনো বিষয়ে রাজ্যের জনগণকে তিনি বিভ্রান্তও করবেন না। কিন্তু এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি এই দুটি কাজই করেছেন। এই আইনটি যখন বিল আকারে ছিল, তখন থেকেই তিনি ক্রমাগত মিথ্যা প্রচার করছেন, বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। এখন তিনি বলছেন, এই আইন তিনি এই রাজ্যে কার্যকর করতে দেবেন না। এবং এ মর্মে সরকারিভাবে বিজ্ঞাপনও দিচ্ছেন তিনি। কিন্তু একাজও তিনি করতে পারেন না। তার এই কাজও সংবিধান বিরোধী। দেশের কোনো আইন নিজ রাজ্যে চালু করব না— এরকম কথা কোনো রাজ্য সরকার বলতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী তো পারবেনই না। তবু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা করছেন। তিনি যা করতে পারেন, তা হলো এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন, সংবিধানের ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। এর বেশি আর কিছুই তার করার নেই। এক্ষেত্রেও আইন চালু করতে দেব না বলে জনগণকে ভুল বোঝাচ্ছেন, বিভ্রান্ত করছেন। নাগরিকত্ব আইনে যখন বলা হয়েছে এই আইনে মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না, তার পরেও এর বিরোধিতায় চড়ামাত্রায় বিবৃতি দিয়ে পদযাত্রা করে আরও বেশি প্ররোচনা জোগানোর কাজ করছেন তিনি। সারা রাজ্যে যে হাঙ্গামা ছড়িয়েছে এর দায় তিনিও অস্বীকার করতে পারেন না। তার এই ধরনের মন্তব্য এবং আচরণ এই হামলাবাজদের আরও উৎসাহী করেছে। হামলাবাজদের দমন করতে তার কঠোর ভূমিকা একদিনের জন্যও দেখা যায়নি। অথচ এই আইনের সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে। কেন্দ্রও বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই আইনে প্রকৃত কী বলা আছে— তা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এমন একটি পরিপ্রেক্ষিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচিত ছিল আর প্ররোচনামূলক কথাবার্তা না বলে সুপ্রিম কোর্টের বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করা। সেটি মুখ্যমন্ত্রী সুলভ কাজ হতো। তা না করে, তিনি প্রতিটি দিন যা করে যাচ্ছেন, তা নিতান্তই অপরিণামদর্শী এক আত্মদর্পী মানুষের আচরণ।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের ফলে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান থেকে আসা যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, পার্সি মানুষরা নাগরিকত্ব পাবেন— তাহলে তাদের পাশে কি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেই? সেটা তো পরিষ্কার করে তাঁকেই বলতে হবে। আসলে তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে যে বাঘটির পিঠে তিনি চেপে বসেছেন, তার হাত থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিস্তার নেই। সেটা মমতাও জানেন। নীচে নামলেই বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। আর তাই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা তাঁকে করতেই হবে। ■

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের শতাব্দী সমারোহ

গত ৮ ডিসেম্বর কলকাতার প্রখ্যাত সাহিত্য সংস্থা শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের শতাব্দী সমারোহ অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয় স্থানীয় রথীন্দ্র মঞ্চে। অনুষ্ঠানের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠী বলেন, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সংগ্রহালয় হলো পুস্তকালয়। কুমারসভা তাদের একশো বছরের ইতিহাসে এই সত্যকে প্রমাণিত করেছে। আজ আমাদের সমাজকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি গ্রাস করতে চলেছে। এর থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র পথ হলো আমাদের সমাজকে পুস্তক-বান্ধবে পরিণত করার দায়িত্ব নিতে হবে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের মধ্যে পঠনপাঠনের সংস্কার জাগাতে হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রূপে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর, প্রধান বক্তা রূপে পুস্তক ন্যাসের পূর্বতন অধ্যক্ষ অধ্যাপক বল্লভভাই শর্মা এবং বিশিষ্ট অতিথি রূপে প্রখ্যাত আয়কর পরামর্শদাতা সজ্জন তুলসীয়ান উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ওমপ্রকাশ নিশ্চল রচিত 'কুমারসভা শতাব্দী' গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত

গায়ক ওমপ্রকাশ মিশ্র। স্বাগত ভাষণ দেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ড. প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী। এরপরেই শতাব্দী স্মরণিকা উন্মোচন করেন শ্রীত্রিপাঠী ও শ্রীধনকর। এই অবসরে সংস্থার বেশ কয়েকজনকে সমাজসেবার জন্য রাজ্যপাল মহোদয়ের হাত দিয়ে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস এবং ধন্যবাদ জানান বংশীধর শর্মা।

শ্রদ্ধার শ্রদ্ধা নিবেদন

বীরভূম জেলার স্বনামধন্য সামাজিক সংস্থা শ্রদ্ধার উদ্যাগে গত ৭ ডিসেম্বর সিউড়ী সংলগ্ন চাঙ্গুরিয়া গ্রামের ৮০ বছর বয়স্ক পুষ্প রানিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ করেন রামপ্রসাদ ঘোষ। পুষ্প রানির পা ধুইয়ে দিয়ে পূজা করেন তাঁর নাতনি পুতুল ধীবর। মাল্যদানে ভূষিত করেন কল্পনা বিষ্ণু। আরতি করেন তুলসী চক্রবর্তী। উত্তরীয় ফল, মিষ্টি, বস্ত্র, গীতা ও মানপত্র দিয়ে ভূষিত করেন মহাদেব মুখোপাধ্যায়, জগবন্ধু ব্যানার্জি, বিষ্ণুপদ রায়, দামোদর ঘোষাল। শ্রদ্ধার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা চৈতালি মিশ্র। সংগীত পরিবশন করেন ঈপ্সিতা ঘোষ ও রুপালি ঘোষাল। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য বলরাম ঘোষ ও শিক্ষক চিন্তাহরণ ঘোষ-সহ বহু গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। সংস্থার সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু জানালেন এ পর্যন্ত ১২১ জনকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলো। অনুষ্ঠান সুচারু রূপে সঞ্চালন করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

কলামন্দিরে পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিকোৎসব

গত ১৫ ডিসম্বর পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা ও হাওড়া মহানগর সমিতির উদ্যোগে কলকাতার কলামন্দিরে ৪০ তম বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবী ভগবতী প্রসাদ গুপ্তা। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন পূজা গুপ্তা। প্রধান বক্তা রূপে ছিলেন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের অখিল ভারতীয় সংগঠন সম্পাদক অতুল যোগ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ও হাওড়া মহানগরের অধ্যক্ষ জিতেন্দ্র চৌধরী ও শঙ্করলাল হাকিম। শ্রীযোগ তাঁর ভাষণ কল্যাণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং বর্তমান কার্যস্থিতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক তথা পূর্বোত্তর ভারতে কল্যাণে আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত বসন্তরাও ভট্টের কর্মজীবন ভিত্তিক লঘু নাটিকা 'কর্মযোগী' পরিবেশিত হয়। বিশিষ্ট অভিনেত্রী শ্রীমতী শুভ্রা অগ্রওয়াল লঘু নাটিকার নির্দেশিকা ছিলেন। পটকথা লিখেছেন শ্রীমতী স্নহলতা বৈদ্য ও শ্রীমতী ইন্দু নাথানী। সংযোজনে শ্রীমতী শকুন্তলা অগ্রওয়াল ও বসন্ত গুপ্তা। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমতী স্নেহলতা বৈদ্য। প্রক্ষাগৃহের দর্শকাসন ভরপুর ছিল।

সোনারপুর বইমেলায় শিক্ষক সঙ্ঘের পুস্তক বিপণির উদ্বোধন

গত ৬ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুরে ৩০ তম বইমেলায় বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘর উদ্যাগে এক পুস্তক বিপণি কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বেধন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে বিপণি কেন্দ্রর উদ্বোধন করেন স্বস্তিকা পত্রিকার পূর্বতন সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য।

উপস্থিত সকলে ভারতমাতার প্রতিকৃতিকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগ সঙ্ঘচালক ড. জয়ন্ত রায় চৌধুরী, বারুইপুর জেলা সঙ্ঘচালক কর্ণধর মালী, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসবী সঞ্জয় সিংহ, বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের জেলা সম্পাদক সৈকত মণ্ডল, বঙ্গীয় নব উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের অপূর্ব মৃধা, জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষণা সঙ্ঘের জেলা প্রমুখ ড. সৌমিত্র মণ্ডল প্রমুখ। ড. আঢ্য তাঁর ভাষণে বলেন, ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও পরম্পরা সম্পর্কে জানতে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। সেক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। অন্যান্য শিক্ষক সংগঠন কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের লেজুর হিসেবে কাজে করে এবং নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘ অন্য সংগঠনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা চায় দেশের প্রত্যেকেই যেন দেশপ্রেমী ও সুনাগরিক হয়। শিক্ষক সংগঠন কেবলমাত্র চাহিদা পূরণের জন্য এক আন্দোলনের কেন্দ্র নয়, রাষ্ট্রের হিতে শিক্ষা, শিক্ষার হিতে শিক্ষক, শিক্ষকের হিতে সমাজ— এহেন আদর্শকে বাস্তবায়িত করাই এই শিক্ষক সঙ্ঘের লক্ষ্য। ড. রায়চৌধুরী তাঁর ভাষণে পুস্তক বিপণি কেন্দ্রের ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্টলে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিল।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃত পণ্ডিত ড. নরেশ চন্দ্র নন্দের দুর্লভ সর্বভারতীয় সম্মান লাভ

দক্ষিণর প্রেসিডেন্সি হিসেবে খ্যাত কলকাতার বিবেকানন্দ কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ (১৯৮৭- ২০০০) ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ ও ভারততত্ত্ববিদ ড. নরেশ চন্দ্র নন্দ সম্প্রতি বেদ ও দর্শনশাস্ত্রে এবং সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সংস্কৃত এবং আধুনিক ভারতে এর বিশেষ প্রাসঙ্গিকতার ক্ষেত্রে তাঁর সুদীর্ঘ কয়েক দশকের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিতে সর্বভারতীয় 'জেকেপিএফ অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে মানপত্র ও পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফ্ট তুলে দেন জীবনকৃষ্ণ ফাউন্ডেশনের অধিকর্তা তথা জীবনবাবুর সুযোগ্য পুত্র ড. বিমল কুমার পাণিগ্রাহী।

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি নিবাসী ড. নন্দ প্রভাত কুমার কলেজের দর্শন বিভাগের প্রথিতযশা অধ্যাপক ও পরবর্তীকালে ওই কলেজেরই অধ্যক্ষ জীবনবাবুর অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন। ড. নন্দ কাঁথি কলেজেও বেশ কযেক বছর অর্থনীতি বিভাগের খ্যতনামা অধ্যাপক ছিলেন। তিনি লন্ডন স্কুল অব বিজনেস স্টাডিস-এর অর্থনীতির অধ্যাপক, উত্তর চব্বিশ পরগনার কাঁচরাপাড়াস্থিত ভারত সরকারের সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট, কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক

অ্যান্ড ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল রিসার্চের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন।

সুদীর্ঘ পাঁচ দশকের বেশি সময় দেশে ও বিদেশে অধ্যাপনা ও গবষণার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ ড. নন্দ অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিপণন, অদ্বৈত বেদান্ত দর্শন, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান, ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত, সাহিত্য সমালোচনা, শিক্ষাপ্রশাসন, আঞ্চলিক শিক্ষা-সংস্কৃতির ইতিহাস এবং অবিভক্ত কাঁথি মহকুমার, অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ও অবিভক্ত বঙ্গের সংস্কৃত শিক্ষার ইতিহাস ও পণ্ডিত সমাজ প্রভৃতি নানা বিষয়ের ওপর বহু মৌলিক জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ বাংলা, ইংরজি ও সংস্কৃত ভাষায় লিখে ও প্রকাশ করে বিপুল খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

উল্লেখ্য, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত নির্বাচন কমিটির সুপারিশক্রমে রাঁচি ও কাঁথিতে আবস্থিত 'জীবনকৃষ্ণ পাণিগ্রাহী ফাউন্ডেশন' বিগত কয়েক বছর ধরে 'বেদ অ্যান্ড ফিলসফি', 'বেসিক সায়েন্সেস', ইনজিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি' এবং ' নিউট্রেশন অ্যান্ড মেডিসিন' —এই চারটি বিষয়ের ওপর সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান, গবেষক ও লেখকদের পুরস্কার প্রদান করে চলেছে।

কাঁথি ও মেদিনীপুরের গৌরব তথা বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বল করা মহান সন্তান, অশীতিপর জ্ঞানবৃদ্ধ ড. নন্দের জীবন সায়াহ্নে এই বিরল সম্মান লাভে স্বভাবতই বিদ্বৎ সমাজ আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করেছেন এবং তাঁকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, ড. নন্দের পিতৃদেব কাঁথি নিবাসী নিখিলশাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতকুলশিরোমণি রমেশ চন্দ্র পঞ্চতীর্থ বেদান্তবিদ্যার্ণব বিদ্যালংকার ছিলেন অবিভক্ত বঙ্গের এক সর্ববরেণ্য মনীষী, বাগ্মী, বেদবিদ এবং সমাজসেবী, সমাজ সংস্কারক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাঁর পবিত্র স্মৃতিতে কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটি তাদের হীরক জয়ন্তীবর্ষে ২০১৮ সালে কাঁথি শহরের এক সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত রাস্তা 'রমেশ চন্দ্র নন্দ পঞ্চতীর্থ সরণী' নামে নামাঙ্কিত করেছে।

আলিপুরদুয়ারে সামুহিক বিবাহ অনুষ্ঠান

উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ধর্মপ্রসার বিভাগের উদ্যোগে গত ৪ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম চ-বাগান প্রখণ্ডে সামুহিক বিবাহ ও পরাবর্তন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সচিব উমাশঙ্কর অচ্যুতানন্দ কর, সুরেন্দ্র সিংহ তোমর, বাবু সিংহ চৌহান এবং প্রদেশের কার্যকর্তা শ্যামজী শর্মা, মহাবীরজী, অনুপ মণ্ডল প্রমুখ। জয়গাঁ থেকে আগত বেশ কয়েকটি পরিবার বনবাসী বর-বধূদের আশীর্বাদ ও গৃহস্থালীর সরঞ্জাম প্রদান করেন। স্থানীয় চা-বাগানের ম্যানজার বিবাহ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাঁচহাজার মানুষ বিবাহ অনুষ্ঠানে সহভোজে অংশগ্রহণ করেন। পরে বনবাসী নৃত্য-গীত পরিবেশিত হয়।

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

ভারতের নারী (রাজস্থান)

সমরেশ মুখোপাধ্যায়

চারজন অসাধারণ রাজপুত নারী। এদের মধ্যে তিনজন চৌহানবংশীয়া আর একজন মেবারের সূর্যবংশের কন্যা। রাজস্থানের মানুষের মনে এদের স্থান অত্যন্ত সম্মান ও অদরের।

হামিরমাতা

আলাউদ্দিন খিলজির চিতোর আক্রমণের ১৩-১৪ বছর আগে মেবারের যুবরাজ অরি সিংহ চিতোর

থেকে কিছু দূরে এক জঙ্গলে সঙ্গীদের নিয়ে মৃগয়ায় গেছিলেন। তাদের তাড়া খেয়ে এক বরাহ বন থেকে বেরিয়ে ভুট্টার খেতে ঢুকে পড়ে। মাচানে দাঁড়িয়ে ওই ক্ষেত পাহারা দিচ্ছিল এক তরুণী গ্রামবালা। সে একটা ভুট্টার গাছ কেটে একদিক বর্শার মতো ধারাল করে বরাহটাকে বিদ্ধ করে রাজকুমারকে দিল। বিকেল বেলা রাজকুমার যখন ঘরে ফিরছিলেন, ওই মেয়েটি আবার তাদের সামনে পড়ল। তখন তার মাথায় দুধভরা হাঁড়ি আর দুহাতে দুটি দুগ্ধবতী মহিষী। অরি সিংহের আদেশে একজন ঘোড়সওয়ার তার দিকে বেগে ঘোড়া চালাল যাতে ভয় পেয়ে মেয়েটি দুধের হাঁড়ি সামলাতে না পারে। সে কিন্তু মোটেই বিচলিত না হয়ে তার একটি পশুকে একটু ধাক্কা দিতেই ঘোড়াসমেত সওয়ার ভূপতিত হলো।

চৌহান বংশের চন্দানো শাখার এই কন্যাকে অরি সিংহ বিয়ে করেন। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রাজকাহিনীতে এই কন্যার নাম বলেছেন লছমী। এই রত্নগর্ভার পুত্র মহাবীর হামির। আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে চিতোর রক্ষায় অরি সিংহ বীরগতি প্রাপ্ত হন। ওই সময় বারো বছরের হামির মায়ের সঙ্গে মামাবাড়িতে ছিলেন। কালক্রমে তিনি মেবারের মহারানা হন। তাঁর চৌষট্টি বছরের রাজত্বে মেবারের শক্তি ও সমৃদ্ধি অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পায়। চারণকবিদের রচনায় হামিরের গৌরবগাথা অমর হয়ে আছে। অল্পবয়সে পিতৃহারা এই অসাধারণ মানুষটির চরিত্র গঠনে তাঁর মায়ের প্রভাব যে কত গভীর ছিল তা অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। হামির

চিতোরগড়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে লছমীরানি বাঈ-জী-রাজ বা রাজমাতার গৌরব ও বৈভব ছেড়ে বনের পাশে নিজের গ্রামে ফিরে যান।

পান্নাবাঈ

তখন মেবারের বড়ো দুর্দিন। মহারানা সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর অল্পবয়সি ছেলেরা কোনো যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেনি। এই অরাজকতার অবসান ঘটাতে রাজপুত প্রধানেরা সংগ্রাম সিংহের ভাই পৃথ্বীরাজ্যের কানীনপুত্র বনবীরকে রাজ্যের ভার নিতে বললেন। বনবীর কিশোর মহারানা বিক্রমজিৎকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করল। সংগ্রাম সিংহের শেষ বংশধর ছ'বছরের বালক উদয়কে গোপনে হত্যা করার জন্যে বনবীর রাতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

পিতৃ-মাতৃহীন উদয়ের দেখাশুনো করত তার ধাত্রী পান্নাবাঈ। এই পান্না ছিল চৌহান বংশের খীচী শাখার কন্যা। বনবীরের মতলব আগেভাগে জানতে পেরে সে উদয়কে একটা ফলের ঝুড়িতে শুইয়ে কেল্লার বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের সমবয়সি শিশুপুত্রকে উদয়ের বিছানায় ঘুম পাড়িয়ে রাখে। বনবীর এসে উদয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে সে আঙুল দিয়ে ছেলের বিছানা দেখিয়ে দেয়। বনবীর ছেলেটিকে উদয় ভেবে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করে। এরপর অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে বিপদশঙ্কুল পথ পার হয়ে উদয়কে নিয়ে পান্না পৌঁছল আরাবল্লীর গভীরে কমলমীর দুর্গে। রাজকুমার কমলমীরে থেকে বড়ো হন এবং কালক্রমে চিতোরের শাসনভার গ্রহণ করেন। উদয় সিংহের অনেক দোষ থাকলেও পান্নাকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং মা বলে

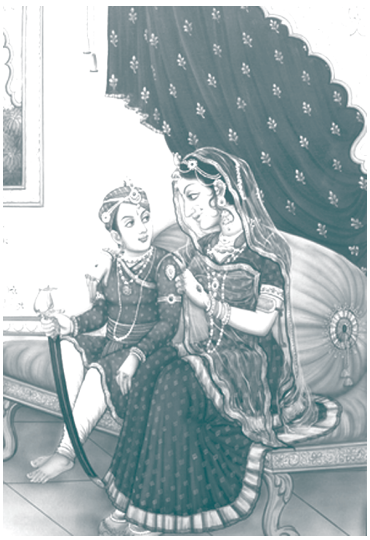

মহারানি জয়বন্তী

সম্বোধন করতেন। সমগ্র রাজস্থান পান্নার নাম আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

মহারানি জয়বন্তী

উদয় সিংহ যখন কমলমীরে বড়ো হচ্ছিলেন যে অল্প কজন রাজপুত নেতা তাঁর পরিচয় জানতেন তাঁদের একজন ঝালোরের সোনগড়া (চৌহানদের অন্যতম শাখা) প্রধান। তিনি উদয়ের পরিচয় সর্বসম্মত করার জন্যে অনেক রাজপুত নেতাদের সামনে উদয়ের সঙ্গে এক থালায় ভোজন করেন এবং নিজের মেয়ে জয়বন্তীর সঙ্গে উদয়ের বিয়ের প্রস্তাব দেন। এরপর রাজপুত নেতাদের উদয়ের পরিচয় সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

এই জয়বন্তীর পুত্র প্রতাপ সিংহ। অত্যন্ত প্রখর ছিল জয়বন্তীর আত্মসম্মান বোধ। স্ত্রৈণ ও অপদার্থ উদয় তাঁর তরুণী পত্নী জয়সলমিরের রাজকুমারীর মোহে মত্ত হয়ে যখন রাজকার্য এবং পারিবারিক কর্তব্য পর্যন্ত অবহেলা করতে শুরু করলেন, মানিনী মহারানি একদিন অপমানিত বোধ করে স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে নিজের মহল ছেড়ে চলে যান। তিনি অবশ্য চিতোরগড়ের মধ্যেই থেকে বালক প্রতাপের শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেন।

এক অযোগ্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ সফল না হলেও সার্থক হয়েছিল মহারানির মাতৃত্ব। মায়ের মহান গুণগুলি বিকশিত হয়েছিল পুত্রের মধ্যে। প্রাতঃস্মরণীয় মহারানা প্রতাপ সিংহের মা হিসেবে এক মহীয়সী চৌহান নারী রাজস্থানের মানুষের মনে আজও পরম শ্রদ্ধেয়া হয়ে আছেন।

মেবারসিংহী

সম্রাট আকবর খুশরোজ নামে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য এক উৎসব শুরু করেন। এই উৎসব প্রতিমাসে একদিন পালিত হতো। ওই দিনে ব্যবসায়ী পরিবারের মহিলারা নানারকম

জিনিসপত্র বিক্রি করার জন্যে দোকান সাজিয়ে বসতেন আর সম্ভ্রান্ত মহিলারা তা কেনাকাটা করতেন। সম্রাটই আকবর মহিলার ছদ্মবেশে ওই মেলায় যেতেন। আবুল ফজল অন্য কথা বললেও রাজপুত উৎস থেকে জানা যায় যে খুশরোজের মেলায় বা মিনাবাজারে রাজপুত মহিলাদের সম্মান নষ্ট হতো। খলনায়ক ছিলেন সম্রাট স্বয়ং।

একদিন খুশরোজের মেলা হয় কেনাকাটা বিকানিরের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ রাঠোরের সুন্দরী তরুণী পত্নী ঘরে ফেরার সময় হঠাৎ দেখলেন যে তাঁর সামনে এক নির্জন জায়গায় সম্রাট দাঁড়িয়ে। আকবর তাঁকে অনেক প্রলোভন দেখিয়ে বশ করার চেষ্টা করলেন। সম্রাট অত্যন্ত চতুর ও কার্যসিদ্ধিনিপুণ হলেও এক্ষেত্রে আগুনের হাত দেওয়ার মতো মারাত্মক ভুল করেছিলেন। এই রাঠোরবধূ ছিলেন মহারানা প্রতাপ সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রী— শক্তিসিংহের কন্যা।

বয়সে প্রবীণ হয়েও ওই চরিত্রহীন তাতার যখন কিছুতেই তাঁর নির্লজ্জ ও ঘৃণ্য উদ্দেশ্য থেকে নিবৃত্ত হতে চাইলেন না, তখন অসহ্য ক্রোধে মেবারসিংহীর দুচোখ আধো অন্ধকারে ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠল। নিমেষে তিনি তাঁর বসনের মধ্যে লুকোনো ছুরিকা আকবরের বুকে স্থাপন করে ইস্পাতকঠিন কণ্ঠে বললেন— ‘‘সাবধান সম্রাট। আমার অস্ত্র বিষাক্ত— এর সামান্য আঘাতেই আপনার প্রাণ যাবে। ভুলে যাবেন না, আমার ধমনীতে বইছে অমিতবিক্রম হামির রানার রক্ত। দিল্লির বাদশা মামুদ খিলজিকে যিনি তিনমাস বন্দি করে রেখেছিলেন। লৌহমানব ‘পত্তো রানা (প্রতাপ সিংহের সংক্ষিপ্ত চলিত রূপ) আমার জ্যেষ্ঠতাত। প্রাণ নেওয়া বা দেওয়া আমার পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। বলুন— ‘আমি জালালুদ্দিন মহম্মদ আকবর পরমেশ্বরের নামে শপথ করছি যে আজকের পর বন্ধ হবে খুশরোজের মেলায় আমার পাপ অভিসার।’ আকবর শপথ করলেন। চারণকবি লিখেছেন যে সেই মুহূর্তে সেখানে সবাহনে আবির্ভূতা হয়েছিলেন দেবী সিংহবাহিনী আর সেই কারণে সম্রাট অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছিলেন।

সেদিন থেকে শেষ হলো খুশরোজের কলঙ্কিত অধ্যায়। আর এর জন্যে রাজপুতেরা চিরঋণী হয়ে থাকল এক অষ্টাদশী মেবারকন্যার কাছে। ■

অনন্তভাবময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী সুনিশ্চিতানন্দ

সংসারী লোকেদের সম্পর্কে ঠাকুর বলেছেন— সংসারী লোকদেরকে যদি বল, সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর, নিতাই দুভাই মিলে পরামর্শ করে বলেছিলেন— 'মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি বোল।' প্রথম দুটির লোভে অনেকে হরি বোল বলতে যেত। হরিনাম সুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারত যে মাগুর মাছের ঝোল হলো হরিপ্রেমে যে অশ্রু ঝরে তাই। যুবতী মেয়ে কিনা পৃথিবী, যুবতী মেয়ের কোল কিনা ধুলায় প্রেমে গড়াগড়ি। নিতাই কোনোরকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন— ঈশ্বরের নামের ভারী মাহাত্ম্য। শীঘ্র ফল না হতে পারে, কিন্তু কখনো না কখনো এর ফল হবেই। যেমন কেউ বাড়ির কার্নিশের ওপর বীজ রেখে গিয়েছিল।। অনেকদিন পর বাড়ি ভূমিসাৎ হলো। তখন সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হলো ও তার ফল হলো।

শ্রীরামকৃষ্ণের যুক্তিবাদী, দার্শনিক একটি দৃষ্টান্ত শিবনাথ শাস্ত্রীকে ভীষণভাবে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল। তিনি বলেছেন— 'আমি একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের দক্ষিণেশ্বরের কক্ষে বসে আছি। কয়েকটি ভক্তও সেখানে উপবিষ্ট। পরমহংস হঠাৎ একসময় কক্ষ হতে বাইরে গেছেন। ভক্তরা নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরের গুণাগুণ বিচার করছেন। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতে করতে বললেন চুপ কর তোরা, ঈশ্বরের গুণাগুণের কথা এভাবে বিচার করে কী লাভ বলতো দেখি, তাঁর মহিমা বুঝতে গেলে স্মরণ, মনন, ধ্যান, ধারণা দিয়ে তা করতে হয়। তর্ক দিয়ে কি বোঝা যায়? ঈশ্বর যে করুণাময় একথা কি যুক্তি দিয়ে সত্যি আমায় বোঝাতে পারিস? এই যে সেদিন সাবাজপুরে বন্যা ও ঝড়ে কত লোকের প্রাণ নষ্ট হলো, এটি করুণার নিদর্শন? তার মধ্যে তোরা হয়তো বলবি, এই ধ্বংসের ফলে ভবিষ্যতের নতুন সৃষ্টির পথ পরিষ্কার হলো। আমি কিন্তু তর্ক করে বলব যিনি সর্বশক্তিমান, একদিক সৃষ্টি করতে হবে কি অন্যদিক ধ্বংস করতে হবে? একজন ভক্ত বলে উঠলেন— তবে কী বলব! ঈশ্বর নিষ্ঠুর! ঠাকুর বলে উঠলেন— আরে বোকা, কে তোকে তা বলতে বলেছে? অনন্ত মহিমার অন্ত কে করবে? তাই তো বলছি কাতর হয়ে যুক্তকরে শুধু প্রার্থনা কর— ঈশ্বর! তোমার মহিমা বোঝবার মতো ক্ষমতা নেই। তুমি কৃপা করে আমাদের জ্ঞাননেত্র খুলে দাও। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর আমগাছের হিসেব নিকেশের গল্পের উপমা দেন।

এই প্রসঙ্গে আরেক দিনের স্মৃতিকথায় শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন : ''একদিন একজন ভক্ত ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন, 'অধ্যাত্মসাধনায়

সদ্‌গুরু প্রাপ্তির ওপর জোর দেওয়া কি যথার্থই অপরিহার্য?' ঠাকুর বললেন, 'নিশ্চয়ই, জন্ম-জন্মান্তরে সঞ্চিত পুণ্যের ফলে মানুষ অধ্যাত্মজীবনে ঈশ্বরপ্রাপ্ত গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। এপথে গুরুর করুণা যে সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। গুরুই শিষ্যকে প্রধানত এ পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেন। শিষ্যের চেষ্টার তেমন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই গুরুই সেই পথকে সুন্দর উপদেশ দিয়ে সুগম করে দিতে পারে। এই বলে পশ্চিমদিকের বারান্দা থেকে পতিতপাবনি গঙ্গায় চলমান একখানি বাষ্পীয় পোতের দিকে উপস্থিত দর্শক ও ভক্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, 'এই স্টিমারটি চুঁচুড়ায় পৌঁছতে কত সময় নেবে?'

একজন বললেন— 'পাঁচ-ছ ঘণ্টা লাগবে।'

তখন শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাদের বললেন— 'হালটানা নৌকায় সেখানে পৌঁছতে পনেরো-কুড়ি ঘণ্টারও বেশি সময় লাগবে। কিন্তু নৌকাটাকে যদি ওই বাষ্পীয় যানটির সঙ্গে জুড়ে দাও, তবে সেও ওটার মতো অল্প সময়ের মধ্যেই নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছবে। যারা মুক্তি চায়, তাদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যবস্থা। তুমি যদি গুরুর নির্দেশ ছাড়াই এ পথে চলতে আরম্ভ কর, তা হলে বহু বিঘ্ন-বিপত্তি অতিক্রম করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে তোমার সময় ও পরিশ্রম কম যাবে না। কিন্তু গুরুর সহায়ে সহজ ও স্বল্প সময়ে তা সম্ভব নয়। এই হলো ধর্মজীবনে গুরুসহায়ের তাৎপর্য।

ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্যে ব্যস্ত থাকায় বেশ কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে যেতে পারিনি। ঠাকুর প্রায়ই আমার খবর নিতেন, কোনো না কোনো ভক্তকে পাঠাতেন। আমাকে তাঁর নিকট যেতে বলতেন। এবং আমিও যাব বলে প্রতিশ্রুতি দিতাম। কিন্তু নানা কাজের মধ্যে তা সম্ভব হতো

না। অবশেষে, স্নেহপরায়ণ ঠাকুর একদিন অন্যত্র যাবার পথে আমার বাসায় উপস্থিত হন। আমার কাছ ঘেঁষে ব্যাকুলকণ্ঠে তিনি বললেন, 'কিগো, আমার কথা বুঝি তোমার মনে পড়ে না? যাব, যাব, বল— অথচ যাও না। ব্যাপার কী তোমার?'

উত্তরে বললাম, 'সমাজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। সেজন্য ইচ্ছা সত্ত্বেও যেতে পারি না।' শিশুর মত রুষ্ট হয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'চুলোয় যাক তোমার ব্রাহ্মসমাজ। যে কাজ করলে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করা যায় না, অমন কাজ করে লাভ কী?' একটু পরে আমার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ তিনি কৌতুকপূর্ণ ভঙ্গিতে বললেন, 'কী মজা হয়েছে জান? আমি যখন তোমার বাড়িতে আসছি তখন এক ভক্ত আমায় বলে, 'আপনি একজন ব্রাহ্মের বাড়ি যাচ্ছেন কেন? তিনি কী এমন পদস্থ ব্যক্তি যে, আপনি নিজে তার বাড়ি যাবেন?'

'আমি তাকে উত্তরে কি বলেছি জান?' আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতেই পরমহংস বললেন, 'আমি বললাম, আমার কাছে সে যে তোমার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়।"

ব্রাহ্মগণের দ্বারা কলকাতাবাসীর মন কিরূপ আকৃষ্ট হয়েছিল, সেদিন কেশব সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্রাহ্মনেতাগণ শ্রীঠাকুরের অভিনব আধ্যাত্মিক ভাব কতদূর গ্রহণ করতে পেরেছিলেন এবং তার ফলে তাদের মধ্যে যে পরিবর্তন উপস্থিত হয় তা লক্ষ্য করতে কলকাতার শিক্ষিত জনগণের বিলম্ব হয়নি। সে সময় ব্রাহ্মগণের পরিচালিত সংবাদপত্রে ঠাকুরের অলৌকিকত্ব ও বাণী তারাই প্রকাশ করেছিল এবং ঠাকুরের পুণ্য দর্শনলাভের আশায় দক্ষিণেশ্বরে অনেককেই আকর্ষণ করত। এরূপ শিশুসুলভ সারল্য মহাপুরুষ বা সাধক যে কোনো মানুষকেই আকৃষ্ট করে থাকে। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন, ''অনেকদিন পর দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছি। ঠাকুরকে তাঁর গৃহে না দেখে ইতস্তত ঘোরাঘুরি করছি। হঠাৎ যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। দেখি, তিনি একটি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তিরধনুক দ্বারা একদল কাক তাড়াতে ব্যস্ত। মনের হাবভাবে মনে হচ্ছিল, সেইসময় তা অপেক্ষা কোনো কাজই তাঁর জীবনে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমি সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী ব্যাপার? আপনি দেখছি একজন তিরন্দাজ হয়ে উঠলেন?' আমার কণ্ঠস্বরে চম্‌কে পিছনে ফিরে ঠাকুর আমায় দেখলেন। দীর্ঘদিন পরে দেখা। তাই আমাকে দেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। অল্পক্ষণেই তিনি ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে তাঁকে তাঁর গৃহে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকার পর তিনি সুস্থ হলেন। তারপর বললেন, 'ওগো! তুমি আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে? এখানকার একজন চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে বলে কথা দেয়। শেষ পর্যন্ত তা রাখেনি।' সাধকের সমস্ত মুখমণ্ডল এক অকপট কৌতূহলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি পরম উৎসাহে বলে চললেন, 'আচ্ছা, তোমার সিংহ দেখতে কেমন লাগে —দেবী দুর্গার সাক্ষাৎ বাহন।' বলতে বলতে তাঁর মধ্যে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগ্রত হয়ে উঠল। ভাববিহ্বল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বারবার তিনি বলতে লাগলেন, 'ওগো, তুমি আমায় সত্যিই নিয়ে যাবে তো?' আমি বললাম, 'সিংহ আমি এর আগে বহুবার দেখেছি। আপনার সঙ্গে থেকে আবার দেখতে পেলে খুশিই হতাম। কিন্তু আজ নানা জরুরি কাজ রয়েছে। তবে আজ আমি আপনাকে সুকিয়া স্ট্রিট পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নরেনের সঙ্গে চিড়িয়াখানায় যাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ এ প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জানালেন।" এহেন শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে শেষ কয়েকবছর খুবই অল্প সাক্ষাৎ করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সেইসময় কলকাতার অভিনেতা-অভিনেত্রীর সঙ্গে যথেষ্ট সাক্ষাৎকার শাস্ত্রীমহাশয়ের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকজন শিষ্যের ঠাকুরকে 'সর্বশক্তিমান' বলে প্রচার করাই তাঁর দক্ষিণেশ্বরের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়।

অনেকদিন পর যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গলরোগে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন কলকাতার বড়ো চিকিৎসকের কাছে স্থানান্তরের ব্যবস্থা হচ্ছিল। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর পরিচিত ব্যক্তির নিকট জানতে পেরে দক্ষিণেশ্বরে তিনি এসে উপস্থিত হন। ঠাকুর তাকে দেখে কিছুক্ষণ রুদ্ধ অভিমানে চুপ করে ছিলেন। অবশেষে, তাঁর এত অসুখেও দেখতে আসেননি বলে শিবনাথকে বারবার অনুযোগ করেছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী স্বীকার করেন, 'তিনি আন্তরিক ব্যথা পেয়েছিলেন জেনে আমিও দুঃখিত না হয়ে পারিনি এবং আমিও অকপটে তাঁকে জানিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে না আসার দুটি কারণ। আমি আরও বললাম— 'আপনার শিষ্যভক্তরা আপনাকে ঈশ্বরের এক নতুন অবতাররূপে প্রচার করছে। আমি সাধারণ মানুষ। ঈশ্বরের এত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে ভরসা পাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই কথা শুনে সরল হাসিতে সমস্ত কক্ষ মুখরিত করে বললেন, 'শিবনাথ, একবার ভেবে দেখ, সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর গলার ক্যান্সারে মরতে বসেছে।' পরবর্তীকালে আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব কলকাতার শ্যামপুকুরে ও পরে কাশীপুর উদ্যানবাটীতে আসেন। অনন্তভাবময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তখন পৌষমাসের মাঝামাঝি সময়ে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি অপরাহ্ণ ৩টার সময় ঠাকুর অসুস্থ অবস্থায় তাঁর শয়নকক্ষ থেকে ধীর পদক্ষেপে উদ্যানবাটীর বসতবাটী ও ফটকের মধ্যস্থলে উপস্থিত হয়ে গিরিশ, রাম, অতুল প্রমুখ ভক্তকে পশ্চিমের আম্রবৃক্ষতলে দেখতে পেয়ে বলেছিলেন : 'গিরিশ, তুমি যে সকলকে এত কথা (শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার) বলে বেড়াও, তুমি কী দেখছ-বুঝেছ?' গিরিশ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ঠাকুরের পায়ে ভূমিতে জানু পেতে বসে ঊর্ধ্বমুখে, করজোড়ে গদগদ স্বরে বলেছিলেন, 'ব্যাস-বাল্মীকি যার ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তার সম্বন্ধে কী বলতে পারি?' একথা শুনে গিরিশকে উপলক্ষ্য করে সমবেত ভক্তগণকে ঠাকুর বলেছিলেন, '**তোমাদের কী আর বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।**' ভক্তগণের প্রতি প্রেম ও করুণার স্রোতে আত্মহারা হয়ে এই কথাটি বলামাত্র সকল ভক্ত ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। এই ঘটনাকেই ঠাকুরের ভক্তগণ তাঁর কল্পতরুরূপে বিশ্বাস করেন, যা আজও এত বছর পর সেই ইতিহাসকে পবিত্র গঙ্গাবারির ন্যায় প্রাণবন্ত করে রেখেছে। সেই কারণেই শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর দৃষ্টিতে দেখা মনীষী ও মহাপুরুষদের দর্শনলাভ করেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তন্মধ্যে অন্যতম প্রধান। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, 'শ্রীরামকৃষ্ণ অনন্ত ভাবময়, তাঁর ভাবের ইতি হয় না, যে যেমন সে সেভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করে চলবে আগামী দেড় হাজার বছর।' যেমন ভাবে গ্রহণ করেছেন ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী।

(কল্পতরু দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত)

রবীন্দ্র এবং অরবিন্দ : সামীপ্য-সান্নিধ্য

ডাঃ সন্দীপন নন্দন ঘোষ

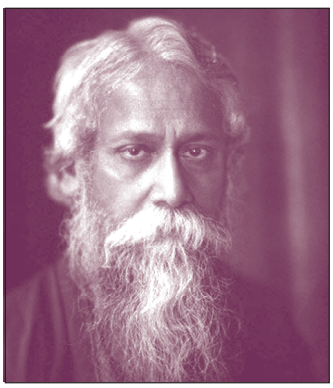

একজন বিশ্ব-কবি আর একজন বিশ্ব-যোগী। শেষ বোধ, বিচার ও বিবেকে বোধহয় তাঁরা অভিন্নই থেকে যাবেন! কারণ কবিকে সুন্দরের অভিসারে যেতে হয়। যোগীকে যেতে হয় পরমের অন্বেষণে। তাদের নির্মিতি যথাক্রমে কাব্য এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব; কিন্তু না আছে সেখানে ভিন্ন ভাব, না আছে বিরোধিতা। কবির নান্দনিক মুগ্ধতা, নন্দনতত্ত্বের অনির্বচনীয়তার শেষকথা হলো আত্ম-উপলব্ধি। কবি হলেন seeker and lover of truth as well as beauty. আবার যোগী হলেন জ্ঞানের অন্বেষক এবং সম্পাদক। দুজনেরই সাধনা সেই পরম সত্যকে, জীবন দেবতাকে জীবনের প্রেক্ষাপটে নব নব রূপে উপলব্ধি। এটাই রবীন্দ্র ও অরবিন্দের নৈকট্য, এটাই তাঁদের সম্মিলন। দুজনেই খোঁজ করেছেন ভারতাত্মার; পেয়েছেন ভারত-দর্শনের এক অনন্য ধারা, ছড়িয়েছেন ভারতীয় মনীষায় বহুমূল্য রত্ন।

অরবিন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'নমস্কার', যার শুরুতেই চমক, ''অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।'' বলেছিলেন, ''অরবিন্দকে তাঁর যৌবনের মুখে ক্ষুব্ধ আন্দোলনের মধ্যে...তপস্যার আসনে দেখেছিলুম। পরে যখন (১৯২৮) পণ্ডিচেরীতে গিয়ে ঋষি অরবিন্দকে দেখে আসেন, তখন সেই পূর্বের কবিতাখানি স্মরণ করেন, ''আজও তাঁকে দেখলুম তাঁর দ্বিতীয় তপস্যার আসনে, অপ্রগলভ স্তব্ধতায়— আজও তাঁকে মনে মনে বলে এলুম— অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহো নমস্কার।'' এতটাই শ্রদ্ধা, এতটাই উচ্চাসন!

রামমোহন থেকে অরবিন্দ পর্যন্ত যেন এক অখণ্ড ভারত সাধনা ও চর্চার ধারা! নব্য-ভারতের পথিকৃৎ হিসেবে ভারত-পথিক রাজা রামমোহন রায়; শাশ্বত-ভারতের মূর্ত প্রতীকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব; প্রবুদ্ধ-ভারতের বাণীমূর্তি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ, বিশ্ব-ভারতীর রূপকার হয়ে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর 'স্বদেশ বাণীমূর্তি'র প্রকাশ ঘটলো শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে।

ভারতবর্ষে স্বরাজ সাধনার ধারা নানান খাতে প্রবাহিত হয়েছিল। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র ও অরবিন্দের চেতনায় স্বরাজ্যের ভিন্নতর ধারাকে সমন্বয় করে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে এনেছিলেন মহারথী সুভাষ। বঙ্কিম-মানসে ছিল অখণ্ড-জাতির ভাবনা আর অসুর বিনাশের যজ্ঞ, সাহিত্য-স্বরাজ। স্বামী বিবেকানন্দে প্রতিভাত হলো ধর্মীয়, অধ্যাত্মিক ও সামাজিক স্বরাজ। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার ধারার মধ্যে মুক্তি পেল ভারতবর্ষের অখণ্ড চেতনার রূপ-রস-গন্ধ। শ্রী অরবিন্দ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সুরে ভারতবীণায় বেঁধে দিলেন রাজনৈতিক স্বরাজবোধ। এই সকল পথের অমোচ্য সংগীতে শুরু হলো স্বাধীন ভারতবর্ষ গঠনের জন্য যুদ্ধ; সুভাষ তার মহাধিনায়ক। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ যার অন্যতম চালিকাশক্তি। এই মহামিলনের পথেই রবীন্দ্র ও অরবিন্দের সামীপ্য-সান্নিধ্য।

২.

১৯০৬ সালের ১৪ আগস্ট জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন থেকে উৎসারিত সাংস্কৃতিক স্বরাজের আন্দোলন)-এর প্রচেষ্টায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হলো 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যান্ড স্কুল'। যার প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলেন রবীন্দ্রনাথ; বিশেষ দিনটিকে অভিহিত করলেন 'সজীব মঙ্গল' বলে; অরবিন্দকে জানালেন তাঁর প্রাণের অভিবাদন। পরিষদের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষাবিদদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন সমান সক্রিয়, যাতে অনাবশ্যক বিষয় পড়িয়ে ছাত্রদের মস্তিষ্কের ভার না বাড়ে, অথচ তা জাতীয় শিক্ষা বলে প্রতীতি হয়। সে নিয়ে ভেবেছেন উভয়েই ১৯০৮ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি পাবনাতে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রেক্ষিতে পাবনা এডুকেশন কনফারেন্স। অন্যান্য শিক্ষাবিদদের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ। দুজনেই অত্যন্ত উদ্দীপনাপূর্ণ ভাষণ দিলেন। অরবিন্দ এই সভায় জাতীয় শিক্ষার প্রস্তাব পেশ করে বললেন, ''There can be no National Education without National control.'' এ ভাবেই অরবিন্দ বাঙ্গলা জুড়ে স্বদেশি ভাবনার মধ্যে জাতীয় শিক্ষার বীজ দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করে দিলেন। পাশ করানো হলো অরবিন্দের শিক্ষা-ভাবনা, তার ভিত্তি প্রস্তরের উপর এক একটি ইট করে গেঁথে মজবুত করে দিলেন অরবিন্দ।

৩.

শান্তিনিকেতনে বসে ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ৭ ভাদ্র রবীন্দ্রনাথ লিখছিলেন 'নমস্কার' কবিতাখানি। শুরু হচ্ছে এইভাবে, ''অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার!'' পাণ্ডুলিপি পাতার উপরে 'ওঁ' লিখে শুরু করছেন কবিতা। তার পরের দুই পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে, অরবিন্দকে কবির সম্বোধন— ''হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ-আত্মার বাণী-মূর্তি তুমি''। তার পরের কয়েক পঙ্‌ক্তিতে অরবিন্দের স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য— ''তোমা লাগি নহে মান,/নহে ধন, নহে সুখ; কোনো ক্ষুদ্র দান/চাহ নাই, কোনো ক্ষুদ্র কৃপা; ভিক্ষা লাগি/বাড়াওনি

আতুর অঞ্জলি!" অরবিন্দের সংকট যাত্রাপথে 'আরাম' যেন লজ্জিত শিরে নত হয়; 'মৃত্যু' ভুলে যায় ভয়। তিনি কবির কাছে বিধাতার শ্রেষ্ঠ-দান; কারণ তিনি পূর্ণ বিশ্বাসে দেশের হয়ে চাইছেন 'পূর্ণ অধিকার', সত্যের গৌরব। আর বিধাতাও যেন তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন, তাই বেজে উঠেছে জয়শঙ্খ।

অরবিন্দ কারাবরণ করেছিলেন (১৯০৮ সালের ২ মে বিপ্লববাদী কার্যকলাপের জন্য 'নবশক্তি' পত্রিকার কার্যালয় থেকে গ্রেপ্তার এবং ৫ মে থেকে আলিপুর জেলে বন্দি), তাই তাঁর ডান হাতে আজ 'কঠোর আদর'। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, এই কারাবেদনা থেকেই দেশের মানুষ বল পাবেন। অরবিন্দ 'রুদ্রদূত', দেবতার প্রদীপ হাতে করেই তাঁর আবির্ভাব। তাই কেউই তাঁকে শাস্তি দিতে সক্ষম হবেন না। এমনকী তাঁর বন্ধন-শৃঙ্খল তারই চরণ বন্দনা করছে, কারাগার জানাচ্ছে অভ্যর্থনা।

লিখছেন মিথ্যাবাদী রাজা তার রাজদণ্ড প্রয়োগ করেছেন এমনই এক ব্যক্তিত্বকে যিনি সৃষ্ট হয়েছেন প্রলয়-অনলে; যিনি মৃত্যু হতে প্রাণ পেয়েছেন। অরবিন্দ যেন বিধাতার নিজের হাতে গড়া হাসিমুখ ভক্ত, আর তাকেই তিনি বিনা অস্ত্রে পাঠিয়েছেন শত্রুর মাঝে রাতের অন্ধকারে। এ কেমন খেলা! তবে কিছুই কী নেই! দুঃখ, ক্ষত, ক্ষতি, সর্বভয়? তবে কিছুই কী নেই! রাজা, রাজদণ্ড, মৃত্যু, অত্যাচার? যদি তা নাই থাকে, যদি বিধাতা পুরুষ নিজের সৃষ্টিকে ভয়ের পরিমণ্ডলে পাঠাতে পারেন অনায়াসে, তবে কেন আমরা ভীরু, মূঢ় হয়ে মাথা নামিয়েছি নীচে? কেন বলতে পারছি না, তোমার চির-সত্তা স্থির শাশ্বত-সত্য বলেই আমাদের মাথা উঁচু করে তুলতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৮ সালে পণ্ডিচেরীতে গিয়ে ঋষি অরবিন্দকে দেখে আসেন, তখন স্মরণ করেন তাঁর পূর্বের কবিতাখানি। পণ্ডিচেরীর অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, ''শ্রীঅরবিন্দ আত্মসৃষ্টিতে নিবিষ্ট আছেন। তাঁর সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ নিয়ম খাটবে না। তাঁকে সসম্ভ্রমে দূরেই স্থান দিতে হবে—সব সৃষ্টিকর্তাই একলা, তিনিও তাই।'' পণ্ডিচেরীতে গিয়ে অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ হবার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যা বলে এসেছিলেন, তা রবির ভাষায় এইরকম :

''আমি তাঁকে বলে এলুম, আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন। এই অপেক্ষায় থাকব। সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে : শৃন্বন্তু বিশ্বে।''

৪.

অরবিন্দের প্রথম ও শেষ তপস্যার মধ্যে কোনো প্রভেদ খুঁজে পাননি রবীন্দ্রনাথ; তাই তপস্যার উচ্চাসনেই তাঁকে বসে থাকতে দেখেছেন। আর সেই আসন ছুঁয়েই তাঁকে প্রণাম করে এসেছেন। অরবিন্দের প্রথম ও শেষ জীবনে কোনো বিরোধ ছিল না। আধ্যাত্মিকতা প্রথম থেকেই ছিল অরবিন্দে; একই ভাবে বিন্যস্ত ছিল তাঁর জাতীয়তাবোধ, ভারত-বোধ ও স্বদেশপ্রীতি। অরবিন্দকে জাতীয় চেতনা ও স্বরাজ-ভাবনায় প্রভাবিত করেছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যে বছর অরবিন্দের জন্ম, সেই বছর (১৮৭২) বঙ্কিম সম্পাদনা করছেন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা। বঙ্গদর্শনে জাতীয়তাবাদের বীজ প্রভূত পরিমাণে ছিল, তা আমাদের সকলেরই জানা। ওখানেই প্রকাশিত হয়েছিল 'বন্দে মাতরম্' গানটি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস দারুণভাবে প্রভাবিত করে যুবক অরবিন্দকে। তিনি পরবর্তীকালে বন্দে মাতরম্ গানটি ইংরেজিতে অনুবাদও করেছিলেন। অরবিন্দ সম্পাদনা করেছিলেন ওই নামেরই একটি পত্রিকা, যেখানে পরতে পরতে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের কথা ছিল।

যারা বলেন অরবিন্দের সশস্ত্র-বিপ্লব আন্দোলন এক সন্ত্রাসবাদ, তারা কি ঠিক বলেন? সেকথা একেবারেই মিথ্যে। কারণ সন্ত্রাসবাদের ভিত্তি হলো বিদ্বেষ, প্রেম নয়। কিন্তু অরবিন্দের বিপ্লবী কর্মপন্থায় ছিল দেশপ্রেম, জন্মভূমিকে বিদেশি শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি; দেশবাসীর প্রতি ভালোবাসা। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদকে তবে কেন সন্ত্রাসবাদ বলা হবে না? কারণ সেটা ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নয়; সেটা শত্রুবোধে বিরুদ্ধবাদীদের বিধর্মীদের হত্যালীলা, নৃশংসতা। অরবিন্দের পথকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করলে, তাঁর সম্পর্কে এমত শ্রদ্ধা উপস্থাপন করতেন না।

অরবিন্দ যা করেছেন তাঁর মূলসূত্র ঔপনিবেশিকতা থেকে ভারতের মুক্তি। মুক্তির দিশা দেখিয়েছেন দু'ভাবে। ১. রাজনৈতিক ভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাকে প্রতিহত করা, যার অঙ্গ হিসেবে রাজনীতিতে জড়িয়েছেন তিনি। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নকে রাজনৈতিক চেতনতার মধ্যে সংযুক্ত করলেন এবং শেষে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে দিশা দিলেন। মনে রাখতে হবে, সে সময় এই পথের মূল কাণ্ডারি তিনিই। সরকারের সব মনোযোগও গিয়ে পড়লো অরবিন্দের উপর। ছাড়া পেলেও তিনি নজরবন্দি হলেন। এই অবস্থায় সশস্ত্র বিপ্লব যাতে চলতে থাকে আপন গতিতে এবং সরকার তাকে কেন্দ্র করে সেই ধারার হদিশ না পায়, তার ব্যবস্থা করলেন। তাঁর মুক্তি তার জীবনের পুনর্জন্ম। এইবার তিনি হাত দিলেন হিন্দুধর্মকে সুসংহত রূপ দেবার জন্য। সেই সময় বড়ো মাপের আধ্যাত্মিক মানুষ দরকার ছিল। কারণ তখনও যুগাচার্য প্রণবানন্দ সেইভাবে আধ্যাত্মিক জগতে আসেননি। কাজেই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ বিষয়েও তিনি ভাবনাচিন্তা করেছেন এবং তা যুগের প্রয়োজনই করেছেন।

ব্রিটিশ-ফরাসি বৈরিতাকেও তিনি কলোনিয়াল প্রভাব মুক্তির সাধনায় ব্যবহার করে থাকতে পারেন। কারণ কলকাতা ছেড়ে তিনি গেলেন ফরাসি কলোনি চন্দননগর এবং তারপর ফরাসি কলোনি পণ্ডিচেরী। ফরাসি রাজশক্তি এমন শক্তিমান মানুষকে সসম্মানে আশ্রয় দিয়েছে। তিনিও ব্রিটিশ পুলিশের দৈনন্দিন প্রভাব মুক্ত হয়ে কাজ করতে পেরেছেন। নানান সময়ে নানান সচেতন ভারতপ্রেমী মানুষ তাঁর কাছে ছুটে গেছেন— চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপত রায়, পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন প্রমুখ। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন।

অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত বোমার মামলা ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনকে বহুমাত্রায় উৎসাহিত করেছিল। তিনি যে এই মামলাতেই গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তা নয়। তার আগেও ১৯০৭ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন। কিন্তু ১৯০৮ সালের কারাবাস ও ১৯০৯ সালে মুক্তি, তার আগে চিত্তরঞ্জনের ঐতিহাসিক সওয়াল সারা ভারতে যা বার্তা যাবার চলে গিয়েছিল। ওটাই তাঁর সব চাইতে বড়ো অবদান। কিন্তু মনে রাখতে হবে, দ্বিতীয় গ্রেপ্তারির আগেই তাঁর জীবনে অন্য সুর বেজে গিয়েছিল। মহারাষ্ট্র নিবাসী যোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্য ঘটলো। শুরু করে দিলেন যোগজীবন। আর জেলের কুঠুরিতে বসে দর্শন ঘটলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, যাঁর জন্ম কারাগারে।

অরবিন্দ বলেছেন ভারতকে বড়ো হতে হবে। কেন? 'উত্তরপাড়া অভিভাষণ' থেকে এ প্রসঙ্গে কিছু উল্লেখ করা যাক। তিনি ৬ মে, ১৯০৯-এ এই অভিভাষণে বলছেন ''অন্যান্য দেশের ন্যায় সে নিজের জন্য উঠছে না।... ভারত চিরদিনই মানবজাতির জন্য জীবনযাপন করেছে, নিজের জন্য নয়, আর তাকে যে বড়ো হতে হবে তাও তার নিজের জন্য নয়, মানবজাতির জন্য।'' এমন মানবতাবাদীর পরবর্তী জীবন তো ধর্মের অসীম মণিমাণিক্য সন্ধানেই গেল। ■

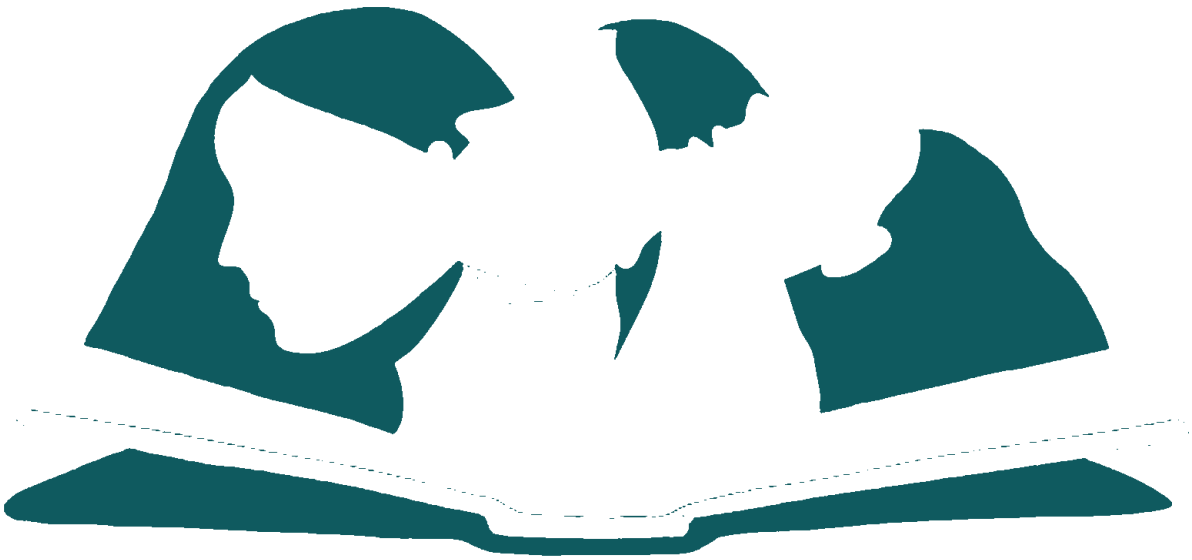

টনিক

রূপশ্রী দত্ত

মেয়ে রুমকির জন্য অনেকদিন ধরে সংস্কৃতের টিচার খুঁজছে সুমনা। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বদলে ঐতিহ্যসম্পন্ন বিখ্যাত স্কুল 'সারস্বত নিকেতন'-এ পড়ে রুমকি। ক্লাস সিক্স থেকে সংস্কৃত শুরু হয়েছে। সুমনা তো সেই কোন সত্যযুগে সংস্কৃত পড়েছিল— কিছুই আর মনে নেই। স্বামী বিজনও অ্যাকাউন্ট্যাসির লোক। অতএব, সেই মানুষটির কাছেও দেবভাষা এক দুরূহ গোলকধাঁধাঁ। প্রতিবেশিনী নিরূপার কাছে সে সন্ধান পেল, মণিমালা সেনের। ভদ্রমহিলা সংস্কৃতে এম.এ। কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নন। কিন্তু, পড়ানোর খ্যাতি আছে। উত্তর কলকাতায় বাস। তিনি বেশ কয়েকটি জায়গায় গৃহশিক্ষকতা করেন।

নির্দিষ্ট দিনে এসে হাজির হন মণিমালা। প্রৌঢ়ত্বে পা রাখা ভদ্রমহিলাকে দেখেই বোঝা যায়, অল্প বয়সে মোটামুটি সুন্দরীই ছিলেন। সপ্তাহে তিনদিন পড়াবার বন্দোবস্ত হলো মণিমালার। রুমকি অল্পদিনেই সংস্কৃতে বেশ উন্নতি করতে লাগল। প্রথম দিনেই রুমকির ফেভারিট 'বাটারস্কচ চকোলেট' দিয়ে মণিমালা বাজিমাত করলেন। এছাড়া ছোটো ছোটো পরীক্ষা নিয়ে, তাতে ভালো ফল করলে, ছোটো ছোটো রঙিন কাঁচের জন্তু উপহার দিতেন। সুমনার চোখ ছানাবড়া। এসব জিনিস যে আদৌ পাওয়া যায়, তাই সে জানত না। সে বলল— 'মণিদি, এত সুন্দর উপহার পেয়ে, ওর লোভ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে।' মণিমালা বলেন— 'এটুকু উপহারের বিনিময়ে ওর কাছ থেকে সেরা কাজটা আদায় করতে পাচ্ছি। তাই, এটা তো একরকম ইন্‌ভেস্টমেন্টই বলা যায়।'

ধীরে ধীরে দুই অসমবয়সি নারীর মধ্যে সখ্য গড়ে ওঠে। সুমনার সেলাইয়ের নেশা। রুমকির পড়ার ঘরে একটা চেয়ারে বসে এমব্রয়ডারি আর উলবোনার ফাঁকে ফাঁকে সংস্কৃতের টুকরো টুকরো কথা কথন সেও আত্মস্থ করে নেয়। রুমকি পড়া শেষ করে উঠে চলে গেলে মণিমালা খুলে বসে গল্পের ঝাঁপি। এতদিনে সুমনা তার কাছে 'তুমি' হয়ে গেছে।

আত্মপরিচয় দেবার ভঙ্গিতে সে বলে 'আমি সুন্দরহাটির সেনেদের বাড়ির মেয়ে। আমার পূর্বপুরুষের নামেই তো রাস্তাটার নাম বিধুশেখর সেন স্ট্রিট। ইতিহাস বইয়ে হয়তো ছবি দেখেছ, সেই মুণ্ডিতমস্তক বিধুশেখর চলেছেন। হাতে গোলাপ ফুল, পেছনে একজন অনুচর, ছত্রধর হয়ে চলেছে।'

সুমনা বিভোর হয়ে শোনে।

'আমরা তো সকলেই আমাদের শেকড়ের সন্ধান হারিয়ে ফেলেছি। আমার কিন্তু কলকাতায় সেইসব হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা, আমাদের সেই পুরোন বাড়িটার গল্প করতে খুব ভালো লাগে। সুমনা বলে— বলুন না মণিদি, আমারও শুনতে খুব ভালো লাগে। মণিমালা অবিবাহিতা। বাবা-মা মারা গিয়েছেন অনেক বছর আগে। এক দাদা ছিলেন। তিনিও ম্যালিগ্‌ন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় গত হয়েছেন। তিনিও ছিলেন অকৃতদার। মণিমালা ঠিকে কাজের লোক নিয়ে একাই থাকেন।

—'জানো সুমনা, আমাদের বিরাট দুর্গাদালান। পুজোর সময় কিংবা বিশেষ

কোনও অনুষ্ঠানে বাড়িতে পেল্লায় সাইজের নোন্‌তা, মিষ্টি তৈরি হয়। আমাদের কুলদেবতা রাধানাথের একশো পঁচাত্তরতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী হলো সেদিন। আমাকে তো আমার জ্ঞাতিরা ছাড়ে না। বলে— 'মণিদি, আপনি স্তোত্রপাঠ করবেন। নইলে পুজো সম্পূর্ণ হবে না। পুরোহিতের পুজো হবার পর, আপনার সুললিত কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ সবাই শুনবে।' আমার পরে ছিল এক কীর্তন-গায়িকার গান। কিন্তু, নিজের মুখে কী আর বলব সুমনা, তাঁর গান শেষ হতে না হতেই আমন্ত্রিত গণ্যমান্য শ্রোতারা বলতে লাগলেন— 'আবার আমরা সংস্কৃত স্তোত্রপাঠ শুনব। রুমকি এরই মধ্যে সংস্কৃতে খুব ভালো নম্বর পেয়ে নতুন ক্লাসে উঠেছে। মণিমালা রুমকিকে পড়াতে এসে সুমনার কাছে বলে চলে নিজের কথা। একনিষ্ঠ শ্রোতা সুমনা। 'আজকাল তো টিভি, এফএম রেডিও থেকে বনেদি বাড়ির পুজো কভার করতে রিপোর্টাররা আসেন। সেইভাবে তাঁরা আমাদের পুজোতেও এসেছিলেন। আমার জ্ঞাতিরা বললেন— মণি, তুমি উচ্চশিক্ষিতা মেয়ে আমাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে তুমিই ভালো সাক্ষাৎকার দিতে পারবে। অতএব, আমিই তাঁদের সব প্রশ্নের উত্তর দিলাম।'

'আচ্ছা মণিদি দু'তিনটে সিনেমা আর সিরিয়াল করে বিখ্যাত হয়ে যাওয়া কুহেলিকা সেন তো তোমাদের বাড়িরই মেয়ে না?'

আপ্লুতকণ্ঠে মণিমালা বলেন, 'ঠিক ধরিয়ে দিয়েছ তো। সুন্দরহাটির পুজোতে কুহেলিকার সেবারের ফটোসেশনে সে তো আমাকে রিপোর্টারদের সামনেই বলল— মণিদি, একাধারে ভক্তিমতী আর আধুনিকা, দুটো দিকই যাতে ফোটে, সেইভাবে আমাকে সাজগোজের টিপ্‌স্ দাও। তাই দিলাম। বাচ্চা মেয়ে। ওর অনুরোধ তো ফেলতে পারি না।'

এক সপ্তাহ হয়ে গেল মণিমালার দেখা নেই। তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সুমনা মণিমালার ফোন নাম্বার লেখা ছোটো খাতাটা খুঁজে পেল না। প্রতিবেশিনী নিরুপাও মণিমালার ফোন নাম্বার জানে না। সুমনা একদিন খুঁজে খুঁজে বিধুশখর সেন স্ট্রিটের সুন্দরহাটির সেনবাড়িতে হাজির হলো। গিয়ে দেখল সেখানে চলছে, অন্য আরেকটি ধর্মীয় উৎসব। সুসজ্জিত নরনারী, পরির মূর্তি, ফোয়ারা, কুলদেবতা রাধানাথের সামনে গান, গোলাপ জলের ঝারি নিয়ে দাঁড়ানো কিশোর-কিশোরী— সবাই আছে কিন্তু, মণিমালা কোথায়? ও জিজ্ঞেস করল তাদের মধ্যে একটি কিশোরকে।

সে বলল— ও মণিপিসিমা? তিনি তো আজ বহু বছরই আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই রাখেন না। তাঁর বাবা, মা, দাদা মারা যাবার পর ইনফ্যাক্ট তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখাই হয়নি। দরজা সবসময়েই হয় বাইরে থেকে, নয় ভেতর থেকে বন্ধ। নিজেকে আড়ালে রাখতে চান বলে, কেউ আর তাঁকে ডিস্টার্ব করে না। তাঁদের শরিকি অংশটা পড়েছে একেবারে এদিকে। ওই যে অন্ধকার সরু সিড়িটা দেখছেন? আমি সঙ্গে যাবো?'

'না না তার দরকার নেই।'

'তাহলে টর্চটা রাখুন।'

আস্তে আস্তে সিঁড়ি উঠতে লাগল সুমনা। একটা অদ্ভুত সোঁদাগন্ধ। দু' একটা উচ্চিংড়ে। কানের কাছে কী যেন উড়ে গেল। আশ্চর্য! আলো-ঝলমলে বনেদি বাড়ির একদিকে যে এমন পোড়োবাড়ির ছাপ, সে তো ভাবাই যায় না। কড়া নাড়তেই খুলে দিল, মণিমালার ঠিকে কাজের মেয়ে। টিম্‌টিমে আলোজ্বলা ঘর। উঁচু সিলিঙে বন্‌বন্ করে পাখা চলছে। চতুর্দিকে অগোছালো, বিশৃঙ্খলার ছাপ। মণিমালা শোওয়া। 'সুমনা, এসেছ? সাতদিন ধরে ভাইরাল জ্বর। একটা খবরও কোথাও দিতে পারিনি। দু' একদিন পরেই যাব। ভাগ্যিস রুমকির পরীক্ষাটা হয়ে গিয়েছিল।'

'না না মণিদি, পুরো সুস্থ হয়েই যাবেন।'

'এই বিনি, একটু চা মিষ্টি আন।'

'না মণিদি, আজ উঠি। আমার বাড়িতে আজ লোক আসার কথা।'

সুমনা ফেরার পথ ধরল। টর্চ ফেরত দিল ছেলেটিকে। ছেলেটি জিজ্ঞেস করল— 'মণিপিসি, ভালো আছেন?'

'সুমনা বলল— 'হ্যাঁ মোটামুটি।'

বাড়ির পথে যেতে যেতে সুমনার মনে হলো, মণিদির অবচেতনায়— স্বপ্নকল্পনায় বোধহয় তাঁর অনুভূতির চেয়ে বড়ো সত্য কিছু নেই। যা হতে পারত, যা হলে ভালো হতো, সেই চিন্তাই তো মানুষের বাঁচার রসদ— জীবনের টনিক। বাস্তবে সেগুলো অলীক হলেও প্রচলিত সত্যমিথ্যার নিরিখে তার বিচার করা যায় না কখনওই। ■

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

ধারাবাহিকতা রক্ষাই চ্যালেঞ্জ : গ্রাহাম রিড

গত কয়েকবছরে ভারতীয় হকি দলের কোচের দায়িত্ব সামলেছেন একাধিক বিদেশি কোচ, যার সিংহভাগই ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান। মাঝে এক বছর ২০১৭-১৮ মরশুমে হরেন্দ্র সিংহের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় দলকে। কিন্তু জুনিয়রদের বিশ্বকাপে ভারতের গৌরবময় সাফল্যের কাণ্ডারি হলেও সিনিয়র বিশ্বকাপে ব্যর্থ হরেন্দ্র। আর তারপরই তাকে সরিয়ে আনা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার গ্রাহাম রিডকে। তাঁর হাতে পড়ে আহামরি কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। তবুও হকি ইন্ডিয়া ও রিড স্বয়ং আশাবাদী এই দলটির সাফল্যের ব্যাপারে। সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন বেটন কাপ উপলক্ষ্যে, অবকাশে দিলেন সাক্ষাৎকারও।

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

□ গত ৮ মাসে কেমন অভিজ্ঞতা হলো ভারতে?

● **গ্রাহাম :** ভারতের হকির আছে সুদীর্ঘলালিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। বহু বছর বিশ্বজুড়ে রাজত্ব করেছে ভারতীয় হকি। এমন একটি দেশে এসে কোচিং করাটা যেমন আনন্দের তেমনি চ্যালেঞ্জিংও বটে। বেশ কয়েক বছর ভারতীয় দল আন্তর্জাতিক বৃত্তে সাফল্য পায়নি। একরকম তলানিতে চলে গেছিল। সেখান থেকে গত ৫-৬ বছরে আবার ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছে ভারত। একাধিক বিদেশি কোচ, ট্রেনার এসেছেন। তাদের ভিন্ন ঘরানার ট্যাকটিক্স ও স্টাইলকে আত্মস্থ করে খেলতে হয়েছে ভারতীয়দের। এতে বহুত্ববাদী একটা ট্যাকটিক্স এবং স্ট্র্যাটেজির সমীকরণ হয়েছে। যেটা পরোক্ষে প্রভাব বিস্তার করেছে ভারতীয়দের চিন্তনে ও খেলায়। আমি এসে এর সবকটার একটা সমন্বয়সাধন করার চেষ্টা করছি। যাতে মাঠে নেমে খেলোয়াড়রা একাধিক ফর্মে খেলতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে। আর বলতে কি এই ভারতীয় দলে হয়তো নিকট অতীতের ধনরাজ পিল্লাই, পারগত সিংহ, জগবীর সিংহের মতো অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন সৃষ্টিশীল খেলোয়াড় নেই। কিন্তু দলের সবাই একবগ্গা ও টিম গেমে স্বচ্ছন্দ। ৬০ মিনিট উঠে নেমে পজিশন অদলবদল করে খেলতে দক্ষ। বর্তমান বিশ্ব হকিতে সাফল্য পেতে গেলে এই ব্যাপারটা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই দলকে নিয়ে আমি আশাবাদী।

□ হল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার পর ভারতে ড্রেসিংরুম সংস্কৃতি কেমন?

● **গ্রাহাম :** আমি অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বিশ্বের

সর্বোচ্চ মঞ্চে খেলেছি এবং রুপো জিতেছি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলকে প্রশিক্ষণ দিইনি কখনো। নেদারল্যান্ড দলকে কোচিং করিয়েছি। নেদারল্যান্ডে স্কুল ও ক্লাবঘর থেকে হকি সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে লক্ষ্য রাখা হয়। প্রচুর হাই পারফরমেন্স ডেভেলপিং সেন্টার চলে দেশ জুড়ে। অসংখ্য অ্যাস্ট্রোটার্ফ। একদম শিশু বয়স থেকেই ডাচ ছেলে-মেয়েরা আধুনিক ও সর্বোৎকৃষ্ট অনুশীলনের মাধ্যমে তৈরি হয়। ভারতে এতদিন পর্যন্ত এই ব্যাপারটা ছিল না। এখন নরেন্দ্র বাত্রা বিশ্ব হকি সংস্থার প্রেসিডেন্ট হবার পর বিদেশি অনুদান ও লগ্নি আসার পথ সুগম হয়েছে। ফলে ভুবনেশ্বর, পুনে ও চণ্ডীগড়ে হাইপারফরমেন্স সেন্টার গড়ে উঠেছে। আর সেখানে প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছে ভারতের সিনিয়র, জুনিয়র ও সাবজুনিয়র স্তরের খেলোয়াড়রা। গতি, শক্তি, টেকনিক স্কিল রিফ্লেক্স সবকিছু অনেক বেড়ে যাবে। অচিরেই ভারতীয়রা বিশ্ব হকির শেষ ধাপে উঠে আসবে। আর ভারতে ড্রেসিংরুম সংস্কৃতি খুবই সন্তোষজনক। কোচকে সিনিয়র-জুনিয়র অসম্ভব সম্মান করে। প্রতিটি উপদেশ ও বক্তব্য মন দিয়ে শোনে। প্রতিটি খেলোয়াড় পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রিজার্ভ বেঞ্চ দলের সঙ্গে এতটাই একাত্ম যে কোনো ম্যাচে স্থান না পেলেও ভেঙে পড়ে না বরঞ্চ সারাক্ষণ তাতিয়ে যায় মূল দলের খেলোয়াড়দের। একটা চমৎকার পারিবারিক আবহে ট্রেনিং চলছে বেঙ্গালুরুতে পরবর্তী বিশ্বজনীন সব প্রতিযোগিতার জন্য।

□ এক বছরের প্রস্তুতিতে কতটা ভালো ফলের আশা করেন টোকিয়োতে?

● **গ্রাহাম :** একবছর সময়টা সত্যি বেশি নয়। আবার খুব একটা কমও নয়। আমার সহকারী ক্রিশ সিরিয়েলো একদিকে যেমন অস্ট্রেলিয়ান অন্যদিকে তিন বছর এই দলটিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন। ভারতে আসার আগে টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত ক্রিশের কাছ থেকে খুঁটিনাটি সবকিছু জেনে নিয়েছি। ভিডিওতে ২০১৭-১৮ মরসুমে বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিক ম্যাচে ভারতের খেলাগুলো একাধিকবার দেখেছি। একটা ব্যবহারিক ধারনা নিয়ে এসেছি। আর যেহেতু আগেই বলেছি এই টিমই অত্যন্ত কার্যকরী হকি খেলে, দলে একগাদা তরুণ খেলোয়াড়, তাই বিশেষ কিছু পরিবর্তন না করে চিরাচরিত সব স্ট্র্যাটিজকে মিলিয়ে 'ফাইন টিউনিং' করার কাজটাই করে যাচ্ছি। ক্রিসও অনেক ইনপুট দিচ্ছে নিয়মিত, যা ভারতীয় দলের খেলায় বিশেষ পরিবর্তন আনতে সহায়ক ভূমিকা নিচ্ছে।

সম্প্রতি বিশ্বের অন্যতম সেরা দেশ বেলজিয়ামে গিয়ে ভারত দৃষ্টিনন্দন হকি খেলে বেলজিয়ামকে একটা ম্যাচে পাঁচ গোল পর্যন্ত দিয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পারলে এবং ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে টোকিয়োর মাঠে ফুল ফোটাবে ভারতীয়রা। ▌

হরির স্বর্গদর্শন

হরি খুব সরল বালক। প্রতিদিন রাতে শোয়ার সময় সে ঠাকুমার কাছে গল্প শুনত। ঠাকুমা তাকে নাগলোক, পাতাল, গন্ধর্বলোক, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক ইত্যাদি অনেক গল্প শোনাত। একদিন ঠাকুমা স্বর্গলোকের গল্প বলছিলেন, তখন হরি স্বর্গ দেখার বায়না ধরল। ঠাকুমা তাকে অনেক বোঝালেন যে, মানুষ স্বর্গ দেখতে পায় না। তখন হরি খুব কাঁদতে শুরু করল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমিয়ে সে স্বপ্নে দেখতে পেল খুব উজ্জ্বল এক আলোকময় দেবতা তার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন— খোকা! স্বর্গ দেখতে হলে মূল্য দিতে হয়। তুমি সার্কাস দেখতে গেলে তো টিকিটের দাম দাও ? স্বর্গ দেখতে হলেও সেরকম মূল্য দিতে হবে। স্বপ্নের মধ্যেই হরি চিন্তা করল যে ঠাকুমার কাছে তারজন্য টাকা চাইবে। কিন্তু দেবতা বললেন--- স্বর্গে তোমাদের জিনিস কেনার টাকা চলবে না। ওখানে সততা ও পুণ্যফল মূল্য হিসেবে দিতে হয়। আচ্ছা। তুমি এই কৌটাটা নিজের কাছে রাখ। যেদিন তুমি ভালো কাজ করবে সেদিন দেখবে এর মধ্যে একটা টাকা এসে জমা হয়েছে। আর যেদিন খারাপ কাজ করবে সেদিন আপনা থেকেই চলে যাবে। ভালো কাজ করতে করতে যেদিন কৌটাটা ভর্তি হয়ে যাবে সেদিন তুমি স্বর্গ দেখতে পাবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে হরি দেখতে পেল বালিশের পাশে সত্যি সত্যি একটা কৌটা রয়েছে। কৌটাটা পেয়ে তার খুশি ধরে না। এ দিন ঠাকুমা ওকে একটা টাকা দিল। টাকা নিয়ে হরি সোজা দোকানে রওনা হলো। পথে একজন রুগ্ন মানুষ তার কাছ ভিক্ষা চাইল। হরি ভাবল লোকটাকে কিছু দেবে না। কিন্তু এমন সময় দেখল তার শিক্ষকমশাই আসছেন। শিক্ষকমশাই উদার মনোভাবের খুব প্রশংসা করেন। তাই হরি রুগ্ন লোকটিকে টাকাটি দিয়ে দিল। শিক্ষকমশাই হরির পিঠ চাপড়ে বাহবা দিলেন।

ঘরে এসে হরি কৌটো খুলে দেখল কোনো টাকা জমা হয়নি। মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল। সেদিন স্বপ্নে আবার সেই দেবতা দেখা দিয়ে বললেন— তুমি প্রশংসা পাবার লোভে রুগ্ন লোকটিকে টাকা দিয়েছিলে, তারজন্য তোমার কোনো পুণ্য অর্জন হয়নি, তাই কৌটায় টাকাও জমা হয়নি। প্রশংসা পাওয়ার আশায় ভালো কাজ করলে ভগবান খুশি হন না।

পরদিন হরি আবার ঠাকুমার থেকে টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে দুটো কমলালেবু কিনল। ফেরার পথে ওর বন্ধু চুনি খুব অসুস্থ শুনে ওদের বাড়ি গেল। তখন চুনিকে দেখতে ডাক্তারবাবু ওদের বাড়ি এসেছেন। ডাক্তারবাবু ওষুধ লিখে দিয়ে চুনির মাকে বললেন আজ ওকে কমলালেবুর রস খেতে দেবেন। চুনির মা কাঁদতে কাঁদতে বললেন আমি অন্যের বাড়িতে বাসন মেজে সংসার চালাই। ছেলের অসুখ থাকায় কদিন কাজে যেতে পারিনি। আমার কাছে লেবু কেনার মতো টাকা নেই। ডাক্তারবাবু চলে গেলে হরি বলল— কাকিমা, আমি চুনির জন্য দুটো লেবু নিয়ে এসেছি। আপনি ওকে রস করে খাইয়ে দেবেন।

হরি বাড়িতে এসে কৌটো খুলে দেখল দুটো টাকা চক চক করছে। আর একদিন যখন খেলতে গিয়েছিল তখন ওর বোন কৌটাটি নিয়ে খেলছে। হরি ফিরে এসেই বোনের হাতে কৌটা দেখে দুমদাম মারত লাগল। বেচারি ছোটো বোন কাঁদতে লাগল। পরে হরি কৌটা খুলে দেখে আগের টাকা দুটো নেই। এতে তার খুব মন খারাপ হলো। সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল আর কোনোদিন খারাপ কাজ করবে না।

এভাবে ধীরে ধীরে হরির স্বভাব খুব ভালো হয়ে গেল। আর ভালো কাজ করতে করতে তার কৌটো টাকায় ভরে উঠল। স্বর্গ দেখার আশায় একদিন সে কৌটো নিয়ে তাদের বাগানে গেল। সেখানে দেখতে পেল একজন সাধু গাছের তলায় বসে কাঁদছে। হরি জিজ্ঞেস করল— বাবা, তুমি কাঁদছ কেন? সাধুটি বলল, ওই যে তোমার হাতে যে কৌটোটি রয়েছে আমারও সেরকম একটি কৌটো ছিল। অনেক পরিশ্রম করে আমি ওটাতে টাকা ভর্তি করেছিলাম। অনেক আশা ছিল ওই টাকাতে স্বর্গ দেখব। কিন্তু আজ গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে কৌটোটি জলে পড়ে গেছে। তাই কাঁদছি।

হরি বলল, আমার বয়স এখন কম। আমি আবার টাকা জমাতে পারব। আমারটা তুমি নাও। সাধু বললেন, তুমি অনেক কষ্ট করে টাকা জমিয়েছ, আমাকে দিলে তোমার খুব কষ্ট হবে। হরি বলল, না আমার কষ্ট হবে না। তুমি বুড়ো হয়েছ। আবার কৌটা ভরাতে পারবে কিনা তার ঠিক নেই। আমার কৌটা আবার ভরে উঠবে। তুমি আমার কৌটাটা নিয়ে নাও। সাধু হরির কাছ থেকে কৌটাটি নিয়ে তার দুচোখ হাত দিয়ে চেপে ধরল। চোখ বন্ধ থাকা সত্ত্বেও হরি দেখল তার সামনে স্বর্গ ভেসে উঠেছে। কী সুন্দর! ঠাকুমা যেমন বলেছিলেন তার থেকেও বেশি সুন্দর। হরি চোখ খুলে দেখল সাধুর বদলে স্বপ্নে দেখা সেই দেবতা তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন— বাছা, যারা ভালো কাজ করে তারা এই পৃথিবীতেই স্বর্গসুখে থাকতে পারে। তুমিও এই পৃথিবাতেই স্বর্গের চেয়ে বেশি আনন্দ পাবে। ভালো কাজ করে তুমি এই পৃথিবাকেই স্বর্গ করে তুলতে পারবে।

শম্ভুনাথ পাঠক

ভারতের পথে পথে

পুণ্যগিরি

পুণ্যগিরিতে কুমায়ুন হিমালয়ের জাগ্রতা দেবী শ্বেতপাথরের অষ্টভুজা সিংহবাহিনী মা ভগবতীর মন্দির। টুনসাস থেকে তিন কিলোমিটার উপরে উঠে রেলিং ঘেরা বিপদসঙ্কুল সিড়ি বেয়ে চার কোণে চার পিলারের ওপর সাত ফুট উঁচু ছোট্টো মন্দির। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এখানে দেবীর কাছে প্রার্থনা করলে মনস্কামনা পূরণ হয়। বহু বছর আগে কুমায়ুনর মহারাজা জ্ঞানচন্দ্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে রয়েছে পত্রহীন এক প্রাচীন বৃক্ষ। এটি সাচ্চা দরবার নামে পরিচিত। পুণ্যার্থীরা মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন সাচ্চা দরবারে। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, এখনও প্রতি রাতে দেবী সিংহপৃষ্ঠে বিচরণ করেন। দেবী সতীর নাভি পতিত হয়েছে এই পুণ্যগিরিতে (অন্যমতে যাজপুরে)। পথ দুর্গম ও দুস্তর। লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হয় অশোকাষ্টমী তিথিতে। চৈত্র মাসের অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা এক পক্ষকাল মেলা বসে। আবার শারদীয়া নবরাত্রিতেও মেলা বসে। ভক্তরা আসেন দূরদূরান্ত থেকে।

জানো কি?

কয়েকজন মহাপুরুষের বাল্যনাম

- ভগত সিংহ— ভাগ্যবান।
- স্বামী বিবেকানন্দ— বিলে, নিমাই।
- বাল্মীকি মুনি— রত্নাকর।
- আদ্য শঙ্করাচার্য— শঙ্কর।
- গোস্বামী তুলসীদাস— রামবোলা।
- চৈতন্য মহাপ্রভু— নিমাই।
- গুরু অঙ্গদদেব— ভাই লহনা।
- দয়ানন্দ সরস্বতী— মূলশঙ্কর।
- সুভাষ চন্দ্র বসু— সুবি।
- স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজ— বিনোদ।

ভালো কথা

পড়াশোনার বয়স নেই

বড়োরা বলেন, পড়াশোনা নাকি বয়স নেই। শুধু ইচ্ছা থাকলেই নাকি হয়। পঞ্জাবের জলন্ধরের সোহন সিংহ গিল ৮৩ বছর বয়সে ইংরেজিতে এমএ পাশ করে সেটাই প্রমাণ করলেন। বৃদ্ধ মানুষটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন বয়স নয়, শুধু মনের ইচ্ছা থাকলেই হয়। জলন্ধর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে একে একে ছাত্র-ছাত্রীরা যখন শংসাপত্র গ্রহণ করছিলেন তখন এই বৃদ্ধকে মঞ্চে উঠতে দেখে অনেকেই অবাক হয়ে যান। পরে বুঝতে পেরে করতালিতে সবাই তাঁকে অভিনন্দন জানান। শংসাপত্র হাতে নিয়ে তিনি বলেন, বয়স হয়ে গেছে ভেবে বসে থাকলে তো চলবে না। ইচ্ছাশক্তি যদি থাকে তাহলে যেকোনো বয়সেই স্বপ্ন সফল করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। তিনি জানিয়েছেন এখন শিশুদের জন্য ইংরেজিতে বই লিখবেন।

বৈশালী গোস্বামী, দ্বাদশ শ্রেণী, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নয়া দিল্লি,

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) লো র আ শ্মি	(১) প্র শ বে অ কা নু রী
(২) খ লু বো রা	(২) গ্য ধা অ ন নু ব যো

১৬ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) পত্রমিতালি (২) পথনাটিকা

১৬ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর
(১) পতিসোহাগিনী (২) পবনমুক্তাসন

উত্তরদাতার নাম
(১) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃদিঃ। (২) আকাশ বাসফোর, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিঃ। (৩) রূপসা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯। (৪) অনিন্দ্য সিংহ, ডিগলীপুর, উঃ আন্দামান।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ১৮।।

ডাক্তারজীকে অকোলা জেলে পাঠানো হলো। বিদর্ভের অনেক সত্যাগ্রহীকে ওখানেই পাঠানো হয়েছিল। ডাক্তারজীর এ যেন শাপে রব হলো। জেলকে তিনি সঙ্ঘ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করে তুললেন।

ডাক্তারজী যখন কাশী গেলেন, শ্রী কাশী বিশ্বেশ্বর মন্দিরের পাশেই মসজিদ এবং গঙ্গার ঘাটে মিনার দেখে মনে বড়ো দুঃখ পেলেন।

শীর্ষ আদালতে স্থগিতাদেশের আর্জি নাকচ, হতাশ বিরোধীরা

ভাস্কর ভট্টাচার্য্য

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল লোকসভা ও রাজ্যসভায় পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে তা আইনে পরিণত হয়। যাকে আমরা বলছি সিএএ বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন। এই আইন তৈরি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ কেন্দ্রীয় সূচি বা লিস্টের অন্তর্গত এই নাগরিকত্ব। রাজ্যের কোনো অধিকার বা ভূমিকা নেই। অথচ কিছু রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ, পঞ্জাব— এরা এর বিরোধিতায় নেমেছে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে সংখ্যালঘু ও অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষে। শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্কের জন্য। এই আইনে নাগরিকত্ব দেবার কথা বলা হয়েছে ধর্মীয় বা সামাজিক কারণে নিগৃহীত সেই সব সংখ্যালঘু মানুষদের যারা পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান থেকে ভারতে দীর্ঘ দশক ধরে শরণার্থী বা উদ্বাস্তু হয়ে আছে।

যেহেতু মুসলমানরা এইসব দেশে সংখ্যাগুরু, তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের সংজ্ঞা অনুযায়ী তারা শরণার্থী নয় এবং সিএএ তাদের জন্য নয়। এতে সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদকে অমান্য করা হয়নি। কারণ এরা এখনো ভারতের নাগরিক নয়। ভারতের সংবিধান শুধু ভারতের নাগরিকদের অধিকারের কথা বলেছে ধর্মমত নির্বিশেষে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে এর বিরুদ্ধে ৫৯টি পিটিশন দাখিল হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার জিগির তুলে। যার মধ্যে মূলত আছে কংগ্রেস, ডিএমকে, মুসলিম লিগ,তৃণমূল ইত্যাদি দল। যারা চাইছে সুপ্রিম কোর্ট এই আইনের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ বা স্টে-অর্ডার দিক। ইন্দিরা জয়সিংহ ও কপিল সিব্বাল এই স্থগিতাদেশ নিয়ে দীর্ঘ সওয়াল করেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কোনো রকম স্থগিতাদেশ না দিয়ে তার থেকে বিরত থাকা এবং পরবর্তী শুনানির দিন ২২ জানুয়ারি ২০২০-তে ধার্য করেন। বিরোধী

পক্ষের আইনজীবীগণ চাপ দিতে থাকেন এই স্থগিতাদেশ দেবার পক্ষে। কারণ একবার এই স্থগিতাদেশ যদি কোর্ট দিয়ে দেয় তবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের এই আইনের শক্তিকে দুর্বল করে দেবে। অর্থাৎ এই আইন, কোর্ট মনে করছে ত্রুটিপূর্ণ। সুতরাং শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত একে কার্যকরী করা যাবে না।

কিন্তু বিরোধী আইনজীবীদের হতাশ করে সুপ্রিম কোর্ট এই স্থগিতাদেশ দেননি। অর্থাৎ এই আইনের ব্যাখ্যা না হওয়া পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট কিছু জানাবে না। এটা কেন্দ্রের পক্ষে প্রথম জয় বলে বিশিষ্টজন মনে করছেন।

ভারত ভাগ হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। নেহরু-লিয়াকত চুক্তি অনুযায়ী ভারত ও পাকিস্তান অঙ্গীকারবদ্ধ হয়— দু'দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দেবার ব্যাপারে। কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তান, বাংলাদেশে ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘুরা (হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান, পার্সি, জৈন) ধর্মীয় কারণে অত্যাচারিত হয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদেরও অধিকার আছে বাঁচার এবং নাগরিকত্ব পাওয়ার।

ভারত যদি তাদের নাগরিকত্ব দেয়, অন্য ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত না করে বা কারোর নাগরিকত্ব হরণ না করে তাহলে এর বিরোধিতা কেন? আসলে মুসলমান অনুপ্রবেশকারীদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদ রয়েছে এইসব বিরোধী দলের নিজস্ব ভোটব্যাঙ্ক বাঁচাতে। তাই তারা আক্রমণাত্মক ও ধ্বংসাত্মক বিরোধিতায় নেমেছে।

কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বিরোধীদের কথায় কর্ণপাত না করে কোনো স্থগিতাদেশ না দেওয়ায় আজ তারা কিছুটা হতাশ। একমাত্র সুপ্রিম কোর্টই শেষ আশা-ভরসা এই বিরোধীদের। কারণ এই আইন নাকচ করার অধিকার এখন আর কারোর নেই।

সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সমস্ত তথ্য পেশ করবে এবং আশা করা যায় বিভিন্ন সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর ভরসা করে করবে। যাতে এই আইন আগামীদিনে বলবৎ হতে কোনো অসুবিধা না হয়।

(লেখক একজন বিশিষ্ট আইনজীবী)

নাগরিকত্ব আইন ধর্মীয় সংখ্যালঘু উদ্বাস্তুদের জন্য সঞ্জীবনীস্বরূপ

রঞ্জন কুমার দে

জাতীয় পর্যায়ের এক সাক্ষাৎকারে অসমের অর্থমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলছিলেন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের তরী পার হওয়ার জন্য নরেন্দ্র মোদীর CAB, NRC-র বাস্তবায়ন না হলেও চলবে। কারণ মোদী নিজেই যথেষ্ট শক্তিশালী ও পারদর্শী নেতা। কিন্তু বিজেপি নির্বাচনী ইস্তেহার পরিপূর্ণ করতে জনগণের কাছে অবশ্যই দায়বদ্ধ। অসমে ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচন এবং ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে CAB ছিলো বিজেপির প্রধান নির্বাচনী ইস্তেহার। স্বাভাবিকভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে রাজ্য তাঁদের মতামত ভোটবাক্সে CAB-এর পক্ষে জানিয়েও দিয়েছিলেন। বস্তুত Citizenship Amendment Act (CCA) বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (যেটি পূর্বে Citizenship Amendment Bill ২০১৬ ছিল) একটি স্বচ্ছ ধর্ম নিরপেক্ষ আইন যেখানে প্রতিবেশী বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আগত ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, পারসি, শিখদের ভারতের পুণ্যভূমিতে নাগরিকত্ব প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন হচ্ছে নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-এর সংশোধিত রূপ। এই আইন অনুসারে উল্লেখিত প্রতিবেশী তিন ইসলামিক দেশ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ভারতে আসা ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা নাগরিকত্ব পাবে। সেইক্ষেত্রে পূর্বের অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিদেশি আইন, ১৯৪৬ এবং পাসপোর্ট আইন, ১৯২০ প্রযোজ্য হবে না। তাছাড়াও এই আইনে নাগরিকত্ব লাভ করার জন্য পূর্বের নূন্যতম ১১ বছর কমিয়ে ৬ বছর করা হয়েছে। এই Citizenship Amendment Bill(CAB) প্রথমে ২০১৬ সালের ১৯ জুলাই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংহের নেতৃত্বে লোকসভায় উত্থাপিত হয়। তারপর বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাত পেরিয়ে বিলটি ২০১৯ সালের চলতি ডিসেম্বর মাসে সংসদের উভয় কক্ষে গৃহীত হলো।

অসমের আঞ্চলিকতাবাদীদের মতে নাগরিকত্ব আইন ১৯৮৫ সালের অসম চুক্তির অবমাননা করেছে। কারণ সেই চুক্তিটিতে ২৪ মার্চ ১৯৭১ সালের পর অসমের অবৈধ সকল হিন্দু-মুসলমানের বিতাড়নের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই স্পর্শকাতর বিষয়ে বিজেপির শীর্ষস্থানীয় কেন্দ্র ও রাজ্যের নেতৃত্ব বারবার অভয় দিয়ে আসছেন আইনটি অসম চুক্তিকে মোটেই আঘাত করবে না, বরং অসম চুক্তির ৬ নং দফাকে আরও শক্তিশালী করে রাজ্যের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, সভ্যতা, রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা থাকবে। আরেকটি বিতর্ক আইনটি নাকি ধর্মের ভিত্তিতে সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদের সমতার অধিকার উলঙ্ঘন করেছে। কিন্তু এই আইনটিতে নির্দিষ্ট কোনো ধর্মের স্বপক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়নি বরং প্রতিবেশী তিনটি ইসলামিক দেশের ৬টি ধর্মীয় সংখ্যালঘুর স্বার্থের কথা বলা হয়েছে। তাই বিলের অপব্যাখ্যা জ্ঞানের অভাবে এবং

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মহান সংবিধান প্রণেতা বি আর আম্বেদকর সংবিধানে স্পষ্ট উল্লেখ করে গিয়েছিলেন ভারতের নাগরিকত্ব আইনের বাইরেও পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ), পশ্চিম পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের যেকোনো ধর্মীয় সংখ্যালঘু ওই দেশের নাগরিক প্রমাণপত্র সহ ১১ বছর ভারতে বাস করলে তারা নাগরিকত্ব লাভ করতে পারবে। প্রতিবেশী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্বদানে কংগ্রেসের প্রাণপুরুষ গান্ধীজী বলেছিলেন, ''The Hindus and Sikhs staying in Pakistan, can come to India by all means, if they do not wish to continue there. In that case it is the first duty of the Indian Government to give them jobs and make their lives comfortable'' (in a prayer meeting September 26, 1947)

এটা সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে নাগরিকত্ব আইনের রূপরেখা স্বাধীন ভারতের জন্মলগ্নেই আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভারতের প্রবীণ রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনেক আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন যে মুসলমান প্রধান দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কোনোভাবেই ভালো থাকতে পারবেন না। তাহলে বিরোধীরা আজকে কেন নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছেন! নাগরিকত্ব আইনের সঙ্গে ভারতীয় মুসলমানদের কোনো লেনাদেনা নেই। কারণ প্রতিবেশী তিনটি ইসলামি দেশ। সুতরাং সেখান থেকে কোনো মুসলমান নাগরিক ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার হতে পারেন না। নাগরিকত্ব আইনে মুসলমানদের নাগরিকত্ব দানে কোনো বাধানিষেধ করেনি, শুধু অবৈধ উপায়ে ভারতে আসা মুসলমানদের বিরোধিতা করেছে। পাকিস্তান থেকে আগত আদনান সামির মতো মুসলমানরা অবশ্যই ভারতীয় নাগরিকত্ব আইনে নাগরিকত্বের সুবিধা লাভ করতে পারেন। নাগরিকত্ব আইনে পাকিস্তানের বালুচ এবং মায়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে যুক্ত করা হয়নি। কারণ বালুচরা ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার নয়, তারা দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত। আর রোহিঙ্গাদের বিষয়টি বর্তমানে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। নাগরিকত্ব আইন প্রতিবেশী এই তিন দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ। অত্যাচারিত এই সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব লাভের জন্য সরকারকে বিশেষ কোনো প্রমাণপত্র দেখাতে হবে না, শুধুমাত্র ফর্মটির একটি ঘোষণার কলাম পূরণ করলেই হবে। ভারতে নূন্যতম ছয় বছর বসবাসের প্রমাণস্বরূপ পৌরসভা বা পঞ্চায়েতের দেওয়া নথিপত্র গ্রহণযোগ্য হবে অন্যথায় দু'জন পরিচিত যারা ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বৈধ নাগরিক তারা ছ'বছর বসবাসের কথা ফর্মে লিখে দিলেই হবে, তবে উত্তরপূর্বাঞ্চলের ষষ্ঠ তফশিলিভুক্ত অঞ্চলগুলি নাগরিকত্ব আইনের আওতায় আসবে না।

ভারতবর্ষের মতো বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশে ভাষাভিত্তিক উগ্রতাবাদ দেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। কারণ দেশের বৃহৎ স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণতাবাদ জনসাধারণের মনে শুধুই বিভাজন সৃষ্টি করবে। ভাষা যদি সত্যিই পরিচিতির বাহক হতো তাহলে প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে কেন বাংলাভাষী হিন্দুদের আজকে দলে দলে রিফিউজি হতে হচ্ছে, কখনো বা 'ডি' ভোটারের তকমায় ডিটেনশন ক্যাম্পে নরকের জীবন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। অথচ এই হিন্দু বাঙ্গালিরা ১৯৭১ সালে বাংলাভাষার টানে গণহারে শহিদ ও মহিলারা ধর্ষিত হয়েছিলেন। ভারতবর্ষে আজকে CAB বা নাগরিকত্ব আইনের দরকারই পড়তো না যদি ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসের সম্পাদিত নেহরু-লিয়াকত চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় পরিচিতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারতো। ভারতবর্ষের প্রত্যেক সাংবিধানিক পদে এবং স্বাধীনভাবে সংখ্যালঘুরা ধর্মীয় জীবনযাপন করতে পারলেও প্রতিবেশী প্রত্যেক ইসলামিক দেশের চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। দেশভাগের পর পাকিস্তানের সংখ্যালঘু ছিল ১৮ শতাংশ, এখন দাঁড়িয়েছে ১.৫ শতাংশে, বাংলাদেশে ২৭ শতাংশ থেকে ৮ শতাংশের কম এবং আফগানিস্তানে কয়েক লাখ হিন্দু সংখ্যালঘু নিঃশেষিত হয়ে আজ মাত্র ৭০০০-এ সীমাবদ্ধ। হিন্দুরা জন্মসূত্রে সহিষ্ণু, তাই ৮৫ শতাংশ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ ভারত, নেপাল আজও ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ভারতের তুলনায় সামান্য জনসংখ্যা নিয়ে ইসলামিক দেশ ঘোষণা করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নিধনে বদ্ধপরিকর। আজ যারা নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছেন, তাঁরা একবার ভারতের পাক-আফগান রিফিউজি ক্যাম্প পরিদর্শন করে আসবেন, হয়তো বা বিবেক জাগতে পারে! একজন পাকিস্তানি উদ্বাস্তু যখন নাগরিকত্ব আইন পাশের খুশিতে নবজাত কন্যার নাম রাখে 'নাগরিকতা' তখন তাঁদের পীড়া একমাত্র ভুক্তভোগীরাই আন্দাজ করতে পারবেন।

মকর সংক্রান্তি উৎসবের শুভক্ষণে
বনবাসী বন্ধুদের সাহায্যার্থে
বস্তু এবং অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন।

তুমি-আমি এক রক্ত

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রম

১৬১/১ এম জি রোড, রুম নং ৫১

বাঙ্গুর বিল্ডিং, সেকেন্ড ফ্লোর, কলকাতা-৭

ফোন : ২২৬৮০৯৬২, ২২৭৩৫৭৯২

E-mail : kalyanashram.kol@gmail.com

নরেন্দ্র মোদী কংগ্রেসের আরও অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন

মণীন্দ্রনাথ সাহা

বহু বিতর্কিত নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৯ রাজ্যসভায় পাশ হলো ১১ ডিসেম্বর। বিলের পক্ষে ১২৫টি এবং বিপক্ষে ১০৫টি ভোট পড়েছে। তার আগেই লোকসভাতেও এই বিল পাশ হয়েছে। এখন রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর বিলটি আইনে পরিণত হলো। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে আসা সেদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ, পারসি ধর্মের নাগরিকরা এদেশের আইনি সুরক্ষা পাবেন, তেমনি এদেশে সম্পত্তি ক্রয়, সরকারি চাকরি পাওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারবেন। আর সবচেয়ে বড়ো কথা যেটি তা হলো বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদলের দাদাদের ব্ল্যাকমেল করে অর্থ শোষণের হাত থেকে বাঁচবেন। কিন্তু যে সমস্ত রাজনৈতিক দল নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে ট্যাঁড়া পেটান তারাই যে সবচেয়ে বড়ো হিন্দু বিদ্বেষী তার প্রমাণ পাওয়া গেল সেদিনের সংসদ অধিবেশনে এই বিলের বিরোধিতা করার মাধ্যমে। সেজন্য এই দলগুলির চরিত্র সম্পর্কে দেশবাসীকে অবহিত করা বিশেষ জরুরি বলেই মনে করি।

কংগ্রেসের সৃষ্টি খ্রিস্টানদের হাতে, কমিউনিস্টদের সৃষ্টি মুসলমানদের হাতে। কংগ্রেস দল প্রথমে খ্রিস্টানদের স্বার্থ দেখেছে, পরে গান্ধীজীর আগমনের পর থেকে মুসলমান স্বার্থ দেখা শুরু। নেহরু পরিবারের হাতে আসার পর কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে মুসলমান স্বার্থের সংরক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। যেমন, আইনের চোখে সবাই সমান হলে সংবিধানের সর্বাঙ্গসুন্দর গাত্রে ৩০/১, ৩০/২ ও ৩৭০ ইত্যাদি ধারাগুলি উপদংশের ক্ষতের মতো বিরাজ করত না (তবে ৩৭০ ধারাটি নরেন্দ্র মোদী বিলোপ করেছেন)। প্রতিটি ধারা উপধারা জাতিধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর উপর সমভাবে প্রয়োগ হতো। দেশভাগের পরিণতিতে সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের যখন মর মর অবস্থা, তখন তার গোড়ায় ধর্মনিরপেক্ষতারূপী সার ও ৩০ এবং ৩৭০ ধারারূপী জল দিয়ে তাকে পুনরায় ফলেফুলে পুনরুজ্জীবিত ও সুশোভিত করে তুললেন। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে কোনো কথা না বলে শুধু হিন্দুদের তেড়ে বেড়াতে লাগলেন।

২০০৩ সালে সুপ্রিমকোর্ট সংবিধানে মুসলমান ও খ্রিস্টানদের জন্য পৃথক পারিবারিক আইনের বিধানকে অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করেছে। কারণ এই বিধানে দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং 'আইনের চোখে সবাই সমান'— এই সনাতন নীতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে। তবুও তা বহাল রয়েছে। আর এই অন্যায় অযৌক্তিক সংবিধান বহির্ভূত বিধানের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নানাবিধ সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছে। এই আইনের বিধানে একই অপরাধে অপরাধী হয়েও হিন্দুরা কীভাবে শাস্তি পাচ্ছে আর মুসলমানরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থাকছে তার এক উপমা দিয়েছেন প্রয়াত দেশসেবক শিব প্রসাদ রায়।

''যে মুসলমানের কাছে বিবাহের কোনো পবিত্রতা নেই, স্থায়িত্ব নেই, আজ বিয়ে করে কাল তালাক দিয়ে পরশু নিকাহ করতে পারে, তিনি বিবাহ করতে পারবেন চারটি। আর যে হিন্দু বিশেষ কারণ না ঘটলে কিছুতেই দুটো বিয়ে করবে না, নিয়ন্ত্রণ আনা হলো তার জন্য। এই সেকুলারিজমের আরও মহিমা আছে। হিন্দু দুটি বিয়ের চেষ্টা করলে তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে তিনটি স্ত্রীর মালিক মুসলমান পুলিশ অফিসার। তাকে বিচার করে সাজা দিতে পারবে চারটে স্ত্রীর মালিক মুসলমান বিচারপতি। সাজাটি কী? সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড।'' (শিবপ্রসাদ রায় লিখিত 'দিব্যজ্ঞান নয়, কাণ্ডজ্ঞান চাই' পুস্তিকা থেকে অংশ বিশেষ)। এই হলো আইনের চোখে সবাই সমানের নগ্ন উদাহরণ।

সংবিধানে লিখিত ইংরেজি বয়ানের অনুবাদ করলে দাঁড়ায়— ''আমরা ভারতের জনগণ এক সার্বভৌম গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে ভারতের সকল নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায় বিচার, চিন্তার, বাক্যের, বিশ্বাসের, ধর্মের, উপাসনার স্বাধীনতা; অবস্থান ও সুযোগের

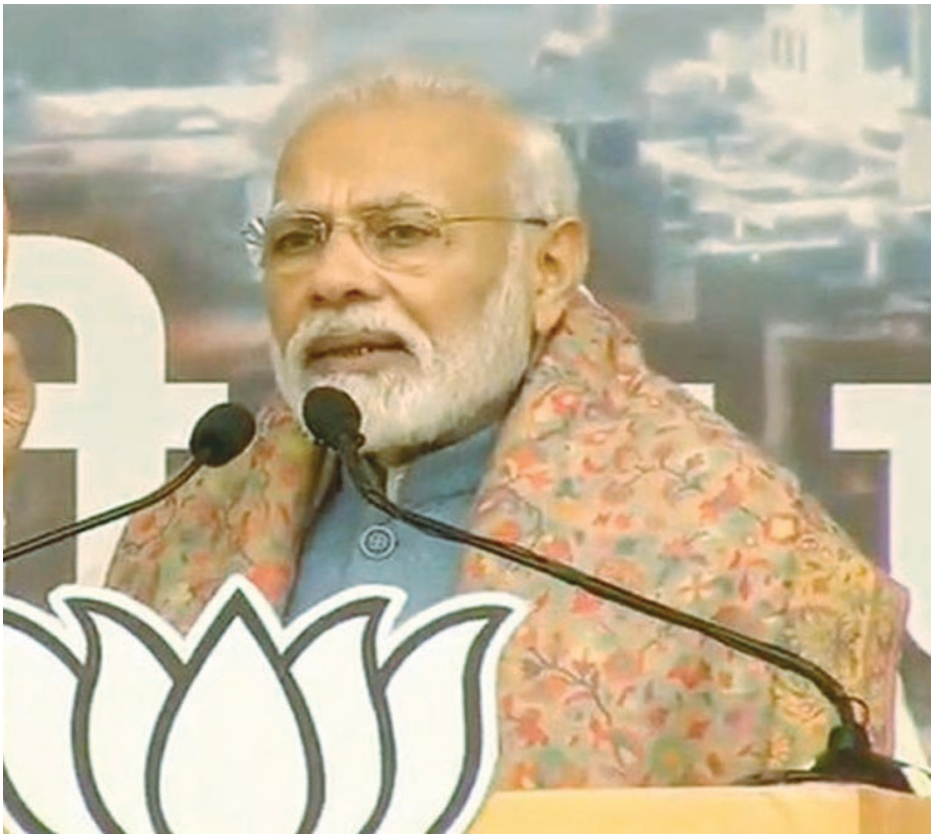

সমতা এবং তাদের সকলের মধ্যে সৌভ্রাত্র বৃদ্ধি করে ব্যক্তির মর্যাদা ও জাতির ঐক্য ও সংহতি রক্ষার উদ্দেশ্যে আমাদের গণপরিষদে এই শাসনতন্ত্র গ্রহণ ও প্রণয়ন করে নিজেদের অর্পণ করছি।"

অতি উত্তম কথা। জাতির উল্লেখ নেই, ধর্মের উল্লেখ নেই, নেই কোনও শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের উল্লেখ। এক কথায়— 'উই দ্য পিপ্‌ল অব ইন্ডিয়া'— 'আমরা ভারতের জনগণ' কথা কয়টিতে একটা সুসংহত ঐক্যবদ্ধ জাতির পরিচয় বহন করে।

কিন্তু কংগ্রেস নেতারা 'মাইনোরিটিজম্' বা সংখ্যালঘু তত্ত্বকেই পুনরায় সংবিধানের অঙ্গীভূত করে নিলেন। যে নীতির ফলে পঞ্জাবে ও পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ হিন্দু, শিখ নর-নারীর রক্তস্রোতে সিন্ধু, গঙ্গা, পদ্মা, তিস্তা, বুড়িগঙ্গার জল লাল হয়ে উঠেছিল এবং এখনও মাঝে মাঝেই উঠছে। সে সমস্ত নির্যাতিত, নিপীড়িত, ধর্ষিতা হিন্দু শিখ নর-নারীর নাগরিকত্ব দেওয়ার বিলের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে জাতি ধ্বংসী, দেশদ্রোহী, হিন্দুদ্রোহী ধর্মনিরপেক্ষী নামধারী রাজনৈতিক দলের নেতারা।

যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এই বিলটিকে অসাংবিধানিক বলছে তাদের মনে রাখতে হবে আমাদের দেশ ধর্মের ভিত্তিতে ও দ্বিজাতিতত্ত্বের উপরেই বিভক্ত হয়ে দুটি দেশে পরিণত হয়েছে, পরে তিনটি হয়েছে। আজ যারা বিরোধিতা করছে সেই কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট দল ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি করতে গিয়ে দেশের ও হিন্দুদের সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

নাগরিকত্ব প্রদান প্রসঙ্গে বহু পূর্বেই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু অতি দৃঢ়তার সঙ্গে পার্লামেন্টে বলেছিলেন— ''There is know doubt that dispplaced persons who have to settle in India are bound to have their citizenship. If law is inadequate in this respect, the laws should be changed" etc. অর্থাৎ কোনো সন্দেহ নেই যে বাস্তুচ্যুত মানুষকে ভারতে স্থায়ী বসবাসের জন্য ভারত তাদের নাগরিকত্ব দিতে বাধ্য। যদি আইনে এই বিষয়ে কোনো খামতি থেকে থাকে, তবে আইন সংশোধন করা উচিত।

সর্দার প্যাটেল একইভাবে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের নাগরিকত্ব নিয়ে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে বলেছিলেন— ''We cannot fully enjoy freedom that we have got untill and unless we share it with the Hindus of Bengal." সাদা বাংলায়, আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগ করতে পারছি না, যতক্ষণ না পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের সঙ্গে এটা ভাগ করে নিতে পারছি।

তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে, হিন্দুদের নাগরিকত্ব বিষয়ে কংগ্রেসের উঁচুদরের দুই ব্যক্তিত্বের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও আজ কেন কংগ্রেস বিজেপির আনা নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছে? মুসলমান ভোটের লোভে না অন্য কিছু প্রাপ্তি যোগের আশায়? আবার কংগ্রেসের রাজনৈতিক গর্ভজাত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল দলই বা কেন এই বিলের বিরোধিতা করল? তিনি তো ২০০৫ সালে অনুপ্রবেশ ইস্যু সংসদে তুলেছিলেন এবং সেই সমস্ত প্রমাণপত্র তৎকালীন লোকসভার স্পিকারের দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলেন। একি শুধু বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা না অন্য কোনো গোপন ব্যাপার আছে যা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। যাইহোক, লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও নাগরিকত্ব সংশোধনী 'ক্যাব' বিল পাশ করিয়ে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রথম বাঙ্গালি জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করে শরণার্থীদের আশ্বস্ত করলেন। সারা পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র হিন্দুদের আশ্রয়স্থল ও ভরসাস্থল। সুতরাং অসমের এনআরসি থেকে বাদ পড়া কয়েক লক্ষ হিন্দু-সহ একজন বাঙ্গালি হিন্দুও এই নাগরিকত্বের তালিকা থেকে বাদ পড়বেন না। হিন্দু জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপি গোড়া থেকেই দাবি করে আসছে যে, দেশভাগ বাঙ্গালি হিন্দুর সঙ্গে যে 'পাপ' করেছে সাত দশক পর তারই প্রায়শ্চিত্ত করা হচ্ছে নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে। নরেন্দ্র মোদী বুঝিয়ে দিলেন কংগ্রেসের করা আরও অনেক পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনিই করবেন। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road. Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সবার প্রিয়

বিল্লদা®

চানাচুর

BILLADA CHANACHUR
KALIKAPUR, BOLPUR, BIRBHUM, WB
Tel.: 03463 252447, Mob.: 9434306796

ভারতের ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠা সম্ভব : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠা ভারতের পক্ষে সম্ভব। তিনি আজ নতুন দিল্লিতে বণিকসভা অ্যাসোচেমের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশ নেন। এই উপলক্ষ্যে কর্পোরেট জগৎ, কূটনীতি ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতকে ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারে পরিণত করার পরিকল্পনা হঠাৎ করে নেওয়া হয়নি।

তিনি বলেন, বিগত পাঁচ বছরে দেশ এতটাই শক্তিশালী হয়েছে যে, শুধু নিজের নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণই নয়, বরং এই লক্ষ্যে আরও অগ্রসর হতেও প্রস্তুত। পাঁচ বছর আগে অর্থ-ব্যবস্থা বিপর্যয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। বর্তমান সরকার এই প্রবণতা কেবল রোধই করেনি, সেই সঙ্গে অর্থ-ব্যবস্থাকে এক সুশৃঙ্খল পথে নিয়ে এসেছে।

''আমরা ভারতের অর্থনীতিতে বুনিয়াদি পরিবর্তন এনেছি, যাতে এই অর্থ-ব্যবস্থা এক সুশৃঙ্খল পথ ধরে এগিয়ে চলতে পারে। আমরা শিল্প সংস্থাগুলির কয়েক দশক পুরনো দাবিদাওয়াগুলি পূরণ করেছি এবং ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠার জন্য আমরা এক শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তুলেছি'' বলেও প্রধানমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ''আমরা ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থাকে প্রচলিত ধ্যানধারণা ও আধুনিকতা— এই দুটি মজবুত ভিত্তির ওপর গড়ে তুলতে চাইছি। আমরা প্রচলিত অর্থ-ব্যবস্থার পরিধির আওতায় আরও বেশি বেশি ক্ষেত্রকে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। এই সমস্ত প্রচেষ্টার পাশাপাশি, আমরা অর্থ-ব্যবস্থাকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি, যাতে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় আরও গতি সঞ্চার করা যায়।''

''এখন আগের মতো কয়েক সপ্তাহ ধরে নয়, বরং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নতুন কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন সম্ভব হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে সীমান্ত বরাবর বাণিজ্যিক লেনদেন দ্রুত সম্পন্ন হচ্ছে। উন্নত পরিকাঠামোর ফলে নৌ-বন্দর ও বিমানবন্দরগুলিতে সময় সাশ্রয় হচ্ছে। আসলে এই দৃষ্টান্তগুলি সবই আধুনিক অর্থনীতির পরিচায়ক'' বলে প্রধানমন্ত্রী অভিমত প্রকাশ করেন।

''আজ আমাদের সরকার শিল্প সংস্থার কথা শোনে, তাদের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, এমনকি তাদের পরামর্শ ও প্রস্তাবগুলির প্রতিও সংবেদনশীল'' বলে মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নিরন্তর প্রয়াসের ফলেই বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহজে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল বাতাবরণ গড়ে তোলার সূচকে ভারত লক্ষণীয় অগ্রগতি করেছে।

''সহজে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুকূল পরিবেশ— একথা শুনলে মনে হয়, কয়েকটি শব্দের সমষ্টি মাত্র। কিন্তু সূচকে অগ্রগতির বিষয়টিতে প্রয়োজন নিরন্তর ও আন্তরিক প্রচেষ্টার। এমনকী, এর সঙ্গে নীতিগত ও আইন সংশোধনের মতো বিষয়গুলিও জড়িয়ে রয়েছে'' বলে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, করদাতা ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে অহেতুক জটিলতা এড়াতে সারা দেশে এক অনুকূল ও কার্যকর কর প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়াস চলছে।

তিনি আরও বলেন, কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে আসতে আমরা অহেতুক জটিলতা মুক্ত এক কর ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী জানান, শিল্প সংস্থাগুলির ওপর থেকে বোঝা কমাতে এবং ভয়মুক্ত পরিবেশে বাণিজ্যিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে কর্পোরেট ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত একাধিক আইনকে ফৌজদারি বিধি ব্যবস্থার বাইরে রাখা হয়েছে।

''আপনারা একথা জানেন যে, কোম্পানি আইনে এমন অনেক ধারা ছিল, যার ন্যূনতম লঙ্ঘন ঘটলেও ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। এখন আমাদের সরকার এ ধরণের ধারাগুলিকে ফৌজদারি বিধির বাইরে নিয়ে এসেছে। আমরা আরও এমন অনেক ধারাকে ফৌজদারি বিধির আওতামুক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছি'' বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশে এখন কর্পোরেট কর সবচেয়ে কম। এর ফলে, আর্থিক বিকাশ হার আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে।

''বর্তমানে কর্পোরেট কর সবচেয়ে কম— এর মানে দেশে যদি কোনও সরকার সবচেয়ে কম কর্পোরেট কর নিচ্ছে, তা হলো আমাদের সরকার'' বলেও প্রধানমন্ত্রী জানান।

শ্রম ক্ষেত্রে সংস্কারের লক্ষ্যে যে প্রয়াস চলছে, সে সম্পর্কেও প্রধানমন্ত্রী বিশদে বলেন। ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থায় আরও স্বচ্ছতা নিয়ে আসতে এবং ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের মুনাফা বাড়াতে যে সংস্কারমূলক প্রয়াস চলছে, তিনি সেকথাও উল্লেখ করেন।

''সরকারের গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলেই আজ ১৩টি ব্যাঙ্ক মুনাফার অর্জনের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এমনকী, ৬টি ব্যাঙ্ককে প্রমপ্ট কারেকটিভ অ্যাকশন বা পিসিও-এর আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। আজ ব্যাঙ্কগুলি দেশ জুড়ে তাদের পরিষেবা বাড়ানোর লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছে। এমনকী, বিশ্ব স্বীকৃতির লক্ষ্যেও এগিয়ে চলেছে।

তিনি বলেন, অর্থনীতিতে এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ও ইতিবাচক পদক্ষেপ ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠার লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করবে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সরকার ১০০ লক্ষ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ ক্ষেত্রে আরও ২৫ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে, যাতে ৫ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের অর্থনীতি হয়ে ওঠার লক্ষ্য পূরণ করা যায়।

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

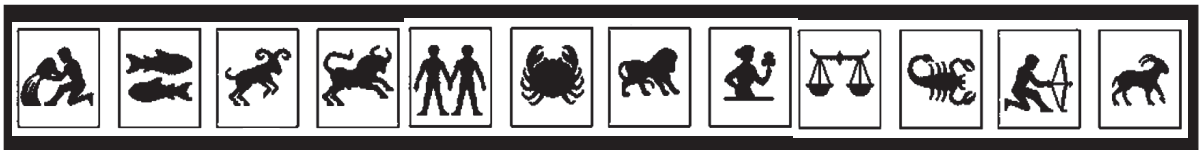

৩০ ডিসেম্বর, ২০১৯ (সোমবার) থেকে ৫ জানুয়ারি (রবিবার) ২০২০। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, বৃশ্চিকে মঙ্গল, ধনুতে রবি, বুধ, বৃহস্পতি, শনি, কেতু, মকরে শুক্র। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র মকরে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র থেকে মেষে অশ্বিনী নক্ষত্রে।

মেষ : তেজস্বী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সমাজে আলোর দিশারি, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদাদি, শিল্প-সৌন্দর্য আনন্দধারায় নীরস মরুর মাঝে সাফল্যের মন্দাকিনী প্রবাহ স্বরূপ। পুলিশ, মিলিটারি, ক্রীড়াবিদ, শল্যচিকিৎসকের কুশলতা ও গরিমা বৃদ্ধি। জীবনসঙ্গীর নামে ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধি। পেশাদারদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার মূল্যায়নে পদোন্নতিতে বিলম্ব তবে কর্মপ্রার্থীর আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলবতী চেষ্টা।

বৃষ : কর্মস্থানে সহকর্মীর চক্রান্ত, বিরোধিতা ও কাজের চাপে মানসিক উদ্বেগ— এমনকী কর্মপরিবর্তনের সম্ভাবনা। পৈতৃক সূত্রে প্রমোটিং, দালালি, ব্রোকারি ব্যবসায় প্রাপ্তি ও শুভ। সহোদর ভ্রাতা- ভগ্নীর কর্মক্ষেত্রে আশাতীত উন্নতি। বাক্‌শক্তি প্রখর থাকায় সুধী সমাজে প্রভাব ও সুহৃদ সম্পর্কে আকর্ষণ বৃদ্ধি। পিতার ক্রনিক রোগে দীর্ঘ চিকিৎসার প্রয়োজন।

মিথুন : দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি শান্তির পথে অন্তরায়। পরিবারে মনের ও মতের মিল না হওয়ায় খিটখিটে মেজাজ। বিমর্ষতা ও একাকিত্ব গ্রাস করবে। শৌখিন, রুচিসম্পন্ন সময়োপযোগী দ্রব্যাদির ব্যবসায় সৌভাগ্যের সোপানে উন্নতি যোগ। বিদ্যার্থীর জ্ঞান পিপাসার চরিতার্থতা ও প্রতিভার ব্যাপ্তি।

কর্কট : আনন্দহীন নিঃসঙ্গ জীবন। কর্মস্থানে অধস্তনের অসহযোগিতা ও প্রতারণা। সপ্তাহের শেষভাগে প্রতিবেশী ও স্বজন বান্ধবের সুপরামর্শ ও বাস্তববুদ্ধির প্রয়োগ কৌশলে হতাশার অমানিশার অবসানে নব সূর্যোদয়। বিজাতীয় রমণীর সান্নিধ্য প্রভাব প্রতিপত্তির সহায়ক।

সিংহ : শারীরিক অসুস্থতা ও ব্যয়বাহুল্যে বিব্রতবোধ করবেন। উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনায়াস সাফল্য। বাদ্যযন্ত্র, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কৃষিযন্ত্রপাতি, পরিবহণ, হোটেল, রেস্তোরাঁ ব্যবসায় ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও লক্ষ্মীর কৃপাবর্ষণ। রেকারিং সঞ্চয়ে ধারাবাহিকতা বজায় রাখবে। রক্তচাপ বৃদ্ধিও স্নায়ুপীড়ায় ক্লেশ।

কন্যা : শরীরের নিম্নাঙ্গের চোট-আঘাত ও দুষিত পানীয় থেকে সতর্ক থাকুন। কলাকুশলী রিসার্চ স্কলার, প্রযুক্তিবিদ, আইনজ্ঞের প্রতিভার ব্যাপ্তি, বহুমুখী কর্মপ্রয়াস পেশাগত ব্যস্ততা, জনপ্রিয়তা ও আভিজাত্য বৃদ্ধি। জীবনসঙ্গীর খ্যাতি-যশ ও আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি, কর্মের যোগসূত্রে পুরানো প্রেমজ সম্পর্কের পুনরাবৃত্তি।

তুলা : উদ্যম, অধ্যবসায়, বুদ্ধিমত্তা ও স্বীয় বিচারধারায় কর্মে সাফল্য ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন। বিশিষ্টজনের উদ্যোগে মিত্রসহযোগে বিদেশ যাত্রা। নতুন উদ্যোগের বাস্তবায়ন, ইমেজ বা সম্মান বৃদ্ধি। সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকলেও মাতার স্বাস্থ্যহানি উদ্বেগের। বিদ্যার্থীদের সাফল্যে বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায় প্রয়োজন। মান-সম্মানের ক্ষেত্র ও মিত্রস্থানকে ভালো বলা যায় না।

বৃশ্চিক : গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, স্বজন বাৎসল্য, নিকট ভ্রমণ, পুরানো গৃহের সংস্কার, জীবনসঙ্গীর শিল্প ও সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক জগতের ব্যক্তিদের যশ ও খ্যাতি। বিদ্যার্থীদের উজ্জ্বল বুদ্ধি, উদ্ভাবনী শক্তি ও বহুমুখী প্রতিভায় অভীষ্ট সিদ্ধিলাভ। কর্মস্থানে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি ও আর্থিক মিশ্রফল যোগ।

ধনু : জীবনসঙ্গীর নামে ব্যবসা করলে ব্যবসার প্রসার ও মুনাফার শুভ ইঙ্গিত। সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নীর উন্নতিতে ছন্দপতন। বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয় স্বজনের সখ্য ও সহযোগিতা লাভ। মানসিক উদ্দীপনায় দাম্পত্য সম্পর্কে নিবিড়তা লাভ।

মকর : বিভিন্ন কাজের চাপে মানসিক উদ্বেগ। বিশিষ্টজনের বিশ্বাস ভঙ্গ, সন্তানের শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। দুর্বল শ্রেণীর প্রতি মমত্ববোধ। অগ্রজের পদোন্নাতি, সম্পত্তি বিবাদের অবসান। যুবক বন্ধু হিতকারী নহে। আর্থিক মন্দাভাব, ক্রয়-বিক্রয় স্থগিত রাখা শ্রেয়। সপ্তাহের শেষভাগে কপর্দকহীন অবস্থায় জেরবার।

কুম্ভ : ব্যবহারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি সাংসারিক ক্ষেত্রে হতাশার কারণ। বিচ্ছেদ হওয়া বন্ধুর সঙ্গে পুনর্মিলন। কর্মে আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তাড়াহুড়োর কারণে অপ্রীতিকর অবস্থা। ঈর্ষাকাতর প্রতিবেশীর কারণে সাংসারিক অস্থিরতা। কথার দাম না রাখায় ছন্দপতন।

মীন : নীতি নৈতিকতা, সদর্থক চিন্তা চেতনা, সারল্য, বিনয়, নম্রতায় বিদ্যা ও কর্মে সাফল্য তথা প্রতিভার স্বাভাবিক বিচ্ছুরণে সম্মান খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। কর্মক্ষেত্রে অধিপত্য বজায় থাকলেও শরীরের উর্ধ্বাঙ্গের চোট-আঘাত, রাজরোষ, স্থানান্তর বিষয়ে সতর্ক থাকা দরকার। কর্মসূত্রে অফিসিয়াল ট্যুর, সম্মান-সহ অর্থ লাভ।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য